আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
১৬-৩১ জানুয়ারি ২০২০ ১-১৫ মাঘ ১৪২৬

মূল্য : ৩০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৬-৩১ জানুয়ারি ২০২০,
১-১৬ মাঘ ১৪২৬
Vol. 8, Issue 2nd, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভেতরের ছবি: সুরজিৎ সরকার

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয়
'নিদ্রিত ভারত জাগে' ৫
কল্পনাশক্তিহীনের স্বৈরাচার ৮

সমসাময়িক
ছি ১০
উপত্যকায় আংশিক স্বস্তি ১২
ইরান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত ১৩

'টুকরে টুকরে গ্যাং' বনাম পারস্পরিকতার পৃথিবী
অনুরাধা রায় ১৭

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে
বার্লিন প্রাচীরে ভাঙন, ইউরোপে কমিউনিজমের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান
অরুণ সোম ২১

মুখ আর মুখোশ
অজয় রায় ২৫

হিন্দুত্বের প্রিজমে ফ্যায়েজ
শান্তনু দে ২৭

হম দেখেঙ্গে
অর্ধেন্দু সেন ৩৩

নতুন 'নতুন দিল্লি'
অমিতাভ রায় ৩৫

মিথ্যাচারে গণতন্ত্র বিকাশের সুযোগ কোথায়?
বরুণ কর ৩৭

সুন্দরবনের অন্দরমহল
কথাকলি মৌলিক ৪০

পিতৃতর্পণ
শুভনীল চৌধুরী ৪৬

অক্ষয়বটের দেশ
বঙ্কিমচন্দ্র: অসমাপ্ত পুনঃপাঠ
কালীকৃষ্ণ গুহ ৪৯

চিঠির বাক্সো ৫৪

পুনঃপাঠ
চলচ্চিত্রে সমকালীনতা
মৃণাল সেন ৫৬

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী (৪নং ফর্ম) 'আরেক রকম' পাক্ষিক পত্রিকার স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞাতব্য।

১. প্রকাশের কাল	:	পাক্ষিক
২. প্রকাশকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৩. মুদ্রকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৪. সম্পাদকের নাম	:	শুভনীল চৌধুরী
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	ফ্ল্যাট-কে-১, ব্লক-৩ ৫০/এ কলেজ রোড পি.ও.-বোটানিক্যাল গার্ডেন হাওড়া ৭১১ ১০৩
৫. প্রকাশের ঠিকানা	:	৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২
৬. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	:	সমাজচর্চা ট্রাস্ট ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২

আমি তৃষিতানন্দ রায় এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১লা জানুয়ারি, ২০২০ স্বাঃ তৃষিতানন্দ রায়

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪২

১. অশোকনাথ বসু
১২৪/৯/১ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২

২. তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২

৩. অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
ফ্ল্যাট ১৬এফ, 'সপ্তপর্ণী'
৫৮/১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৪. তৃষিতানন্দ রায়
এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৯১

৫. অমিতকুমার রায়
ফ্ল্যাট ৩সি, পুষ্প অ্যাপার্টমেন্ট
৬৩এ ব্রাইট স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৬. অমিতাভ রায়
ফ্ল্যাট-৪
১৫৭বি, প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২

৭. সুজিত পোদ্দার *কার্যনির্বাহী সদস্য*
এ. কে. ১২৭, সেক্টর ২, বিধাননগর
কলকাতা ৭০০ ০৯১

পাঁচ হাজার টাকা ট্রাস্ট-কে অনুদান দিলে আজীবন 'আরেক রকম'-এর প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

‘নিদ্রিত ভারত জাগে’

সম্পাদকীয়র শুরুতেই যেটা স্পষ্ট করে বলা দরকার, যে এই মুহূর্তে দ্বিধাহীন পক্ষ বাছবার সময়। ব্যারিকেডের ওধার এবং এধার। আর ব্যারিকেডের কোন পক্ষে আপনি থাকবেন, সেটা নির্ধারণ করে দেবে আপনি কোন দিককে আঘাত করছেন তার উপর। তাই স্পষ্ট ভণিতাহীনভাবে এই সম্পাদকীয় জানাতে চায় যে বিজেপি, সংঘপরিবার শুধুই নয়, আমরা সেই সকলের বিরুদ্ধে যাঁরা এই পরিস্থিতিতে দোদুল্যমান, রাজনৈতিক শুদ্ধতার দোহাই দিচ্ছেন অথবা নীরব থাকছেন। এই সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্যই হল তাঁদের ভাবাবেগে আঘাত করা। একজন ফ্যাসিস্টের সঙ্গে এক টেবিলে দশজন মানুষ প্রাতরাশ সারবার অর্থ হল এগারোজন ফ্যাসিস্টের সমবেত প্রাতরাশ, এমনতর তথাকথিত অসহিষ্ণু গাঁট মনোভাব বজায় রেখেই আমরা এগোব। পাঠক, আপনি পক্ষ বাছতে না চাইলে এই সম্পাদকীয় আর পড়বেন না, কারণ আপনার ভাবাবেগ নামক নরম নিটোল ফুলের মতো পবিত্র গোলাপফুলে রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতার ছুরিটি আমূলে বসিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে, যা কিছুদিন আগে ঘটেছে জামিয়া-মিলিয়া-তে, অথবা আলিগড়ে, মাঝে মাঝেই যা ঘটতে যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেটা আসলে একটাই প্রবণতার অঙ্গ। ভারতীয় ফ্যাসিস্টদের অন্তর্লীন হীনম্মন্যতা। ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থীরা চরিত্রে ক্ষুদ্র। তাদের মধ্যে না আছে সৃজনশীলতা, না আছে মেধা, আর না আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা, যেগুলির দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে আকৃষ্ট করা যায়। এগুলির অভাব পূরণ করতে গেলে লাগে ছলচাতুরি, চাতুর্য এবং অন্ধ পেশিশক্তি। বহুকাল ধরে, যখন কংগ্রেস ও বামেদের আধিপত্য ছিল চিন্তার জগতে, এই দক্ষিণপন্থীরা উপহাসের বস্তু হয়ে এসেছে। তাজমহলের নীচে হিন্দু মন্দির ছিল অথবা রামসেতু নির্মাণ করেছিল বানরসেনারা, এবংবিধ নানা তত্ত্ব হিন্দুত্ববাদী কতিপয়ের মনের আখ্যান থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা চেতনায় সংগত কারণেই এসবের স্থান হয়নি। হিন্দুত্ববাদীরাও এমন কোনো চিন্তাবিদ নিজেদের ক্যাম্প থেকে তুলে ধরতে পারেনি যিনি ধারে ও ভারে কংগ্রেসি বা বামপন্থী চিন্তাবিদদের সমতুল্য। শেষ কিছু বছর ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর হিন্দুত্ববাদ তার বহু-আকাঙ্খিত সম্মান লাভ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই

ইপ্সিত সম্মান, যা গণমানস এতকাল তুলে রেখেছিল ইরফান হাবিব বা রোমিলা থাপারদের জন্য, হিন্দুত্ববাদ এখন সেগুলির অংশভাক্ হতে চায়, চায় সীতারাম গোয়েল অথবা পিএনওক বসুন ইরফান হাবিবের পাশেই। কিন্তু হায়, হালের তুলনায় পানি যে অনেকটাই গভীর, সেটা তারাও জানে। যোগ্যতায় অর্জন করতে না পারলে তাই দরকার হয়ে পড়ে গায়ের জোরে ছিনিয়ে নেবার। দেশের যে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আমাদের গর্বস্বরূপ, যাদের থেকে মূলত বরেণ্য চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকেরা বেরিয়েছেন, সেগুলির ওপর দখল চাই। কারণ একটাই। ইপ্সিত সম্মানের খোঁজ। ভোটে জিতলেও হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি অথবা সায়েন্স কংগ্রেসে বৈদিক বিজ্ঞানের গাঁজাখুরি তত্ত্ব দিয়ে গণমানসে বিদ্ববেত্তার সম্মান পাওয়া যায় না। মানুষ ভয়ে, ভক্তিতে বা প্রয়োজনে ভোট দিতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধার আসনে বসায় সেই উদারনৈতিকদেরই। তাই দরকার হয়ে পড়ে উদারনীতির পীঠস্থান এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ। তাদের গায়ের জোরে কবজা করতে চাওয়া। পুণে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের মাথায় গজেন্দ্র চৌহান নামক তৃতীয় শ্রেণির অভিনেতাকে বসানো দিয়ে যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত, সেটাই যেন পূর্ণ ভরবেগ পেল জেএনইউ-তে এবিভিপি নামক সমাজবিরোধীদের আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। এমনকী এবার মেয়েদের হস্টেল অথবা অধ্যাপকেরাও আক্রমণের মুখ থেকে বাদ গেলেন না। বাংলা প্রবাদে আছে, কুঁজোর মাঝে মাঝে চিত হয়ে শোবার আকাঙ্খা জাগে। কিন্তু বিছানা যদি সেই আকাঙ্খা দেখে অট্টহাস্য করে, তখন উপায় কী? উপায় একটাই। প্রবল রাগে বিছানা-বালিশ পুড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ারই যে সমান ও বিপরীত একটি প্রতিক্রিয়া থেকে যায়, সেটা নরেন্দ্র মোদীর আগেই যেন কী এক অজ্ঞাত উপায়ে আমরা জেনে গিয়েছিলাম। আর তাই, প্রতিরোধ নামক যুগযুগান্তরসঞ্চিত পবিত্রতম আখ্যানটির নব নব অধ্যায় রচিত হতে দেখলাম চোখের সামনে। বিজেপি যখন কাশ্মীর অবরুদ্ধ করল, ইতিউতি প্রতিবাদের বেশি কিছু হয়নি। রামমন্দির নিয়ে যখন রায় বেরোল, গণবিক্ষোভ দেখা গেল না। সংসদে প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মদমত্তে শাসক দল ভেবে নিল, এবার তারা যা খুশি তাই করতে পারে। এনআরসি, সিএএ, জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া, সমস্ত অন্যায়কেই জনসমর্থন নামক গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব, এমন অলীক ধারণার বশবর্তী হয়ে আর এক পা এগোতে গিয়েই ঘটল বিপর্যয়। বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। আর এই অগ্নুৎপাতের সম্মুখবর্তী নেতৃত্বদানে কারা এগিয়ে এলেন? অদ্ভুতভাবে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়। বস্তুত, এখনও অবধি ভারতে চলমান আন্দোলনগুলো সংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। তা হলে কারা এই গণঅভ্যুত্থানের কাণ্ডারী? চোখ বুজে বলা যায়, ছাত্র এবং মহিলারা। জামিয়া মিলিয়া এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের আক্রমণের মুখে রুখে দাঁড়ানো আয়েশাদের ছবি এখন ঘরে ঘরে। জেএনইউ-তে ঐশী ঘোষ, যিনি মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে সংবিধান হাতে চলে এসেছেন লড়াইয়ের ময়দানে। শাহিনবাগের সেই জননী, যিনি দুধের শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধরনায় বসে আছেন আজ কত সপ্তাহ হয়ে গেল। এমনকী পার্ক সার্কাসে খোলা আকাশের নীচে রাত জাগছেন মহিলারাই। বলিউডেও মূলত সরব হয়েছেন মহিলারাই। তাপসী পান্নু, স্বরা ভাস্কর থেকে শুরু করে সোনম কাপুর। সাম্প্রতিক দীপিকা পাড়ুকোনের জেএনইউ-তে আসা তো বহুচর্চিত। আবার অন্যদিক দিয়ে ভাবলে, এটাই স্বাভাবিক নয় কি? মহিলারা তাঁদের যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে জানেন যে যে-কোনো যুদ্ধে ঘর ভাঙে তাঁদেরই। সর্বাধিক নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, ধর্ষিত হন তাঁরাই। আর ভারত এখন গৃহযুদ্ধের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি নামক বর্বর মধ্যযুগের একটি মনুষ্যেতর প্রজাতির দল টুকরে টুকরে গ্যাং-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চাইছে গোটা দেশ। তাই মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে পড়েছেন সম্মুখসমরে। এ এক অভুতপূর্ব অধ্যায়। পীড়িত লাঞ্ছিত একটি ভূখণ্ডে যখন ঘোর অমানিশা ছেয়ে ফেলেছে বোধবুদ্ধির চরাচর, তখন জাগ্রত চোখে এবং অকম্পিত চরণে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে আমাদের মেয়েরা। আগামী ইতিহাসের ম্যাক্সিম গোর্কিরা তৈরি থাকুন, মাদার উপন্যাসের পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

আর এখানেই যে প্রশ্নটা মাথায় আসে, বিজেপি কি নারীশক্তির এই জাগরণকে মেনে নিতে পারছে না বলেই এমন আক্রমণ? মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থার উচ্ছিষ্টভোগী হিসেবে বিজেপি সর্বদাই চায় মেয়েরা যেন রান্নাঘরের বাইরে না বেরোয়, সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আজ এইরকম প্রতিরোধের চেহারা কি তাদের ধ্বস্ত পৌরুষকে এতটাই বিপন্ন করে তুলল যে লিংগ-আধিপত্যের ধ্বজা সুউচ্চ তুলে ধরবার উদ্দেশ্যেই এমন

আক্রমণ? লক্ষ করলে দেখা যাবে, আক্রমণের লক্ষ কিন্তু মেয়েরাই হচ্ছে। ঐশি ঘোষের মাথা ফাটিয়ে হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ধেয়ে এসেছে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা ও ধর্ষণের হুমকি। শাহিনবাগের জননী নিজে সটান দাঁড়িয়ে পুলিশকে আটকেছেন, না হলে আক্রান্ত হতেন তিনিও। আইটি সেল তাদের নোংরামির শেষতম নিদর্শন হিসেবে এখন ঐশী ঘোষ বা দীপিকা পাড়ুকোনের চরিত্র হননের খেলায় নেমে পড়েছে। সেটা অবশ্য এদের কাছ থেকে প্রত্যাশিতই। যেটা প্রত্যাশিত নয় তা হল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে মহিলা হয়েও এমন অসংবেদী আচরণ। একদিকে রাস্তায় নেমে 'ক্যা ক্যা ছি ছি' জাতীয় কমেডি করবেন, অন্যদিকে বিজেপি-বিরোধী ধর্মঘট পালনে বাধা দেবেন, পার্ক সার্কাস ময়দানে খোলা আকাশের নীচে রাত জাগা প্রতিবাদী বৃদ্ধা অথবা তরুণীদের মাথার উপর একটা ছাউনি অবধি বিছিয়ে দেবার অনুমতি দেবেন না— সিবিআই নামক জুজুর ভয় কি এতই মর্মান্তিক যে মামলা প্রত্যাহার নামক মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে তথাকথিত আগুনখেকো নেত্রীকে পরিণত করে ফেলা যায় বিজেপি-র বিশ্বস্ত নৈশরক্ষীতে? পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি আপাতত ঘর খোলা রেখেই নিশ্চিন্ত নিদ্রায় যেতে পারে, কারণ পাহারাদার হিসেবে দরজায় মোতায়েন আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর গলার শেকল আপাতত অমিত শাহের হাতে ধরা।

কিন্তু আপাতত তাতে কিছুই এসে যাচ্ছে না। কারণ এই আন্দোলনের মমতা বা সোনিয়া গান্ধী বা সীতারাম ইয়েচুরি কেউই খুব বড়ো ফ্যাক্টর নন এই মুহূর্তে। এঁরা সকলেই চলমান এক একটি ট্রেন, যে ট্রেনগুলি ভারতবর্ষ ২০২০ নামক স্টেশনে এসে যদি না থামে, তা হলে ভবিষ্যতে অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় এদের যাত্রীশূন্য বগিগুলির স্থান হবে ভুলে যাওয়া কোনো কবরখানাতেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা কোন দিক বেছে নেবেন, সেটা তাঁদের ব্যাপার। কিন্তু ঐশী ঘোষের তা দিয়ে কিছুই বদলাবে না। তিনি মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে সংবিধান হাতে উঠে দাঁড়িয়ে আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ের কথা বলে দিয়েছেন— ওদের লাঠির জবাবে আমরা সংবিধান খুলে ধরব। ওদের নোংরা কটূক্তির উত্তর দেব বিতর্কের মাধ্যমে। এই যে ছাত্রসমাজ দিকে দিকে জাগছে, প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে আইআইটি, আইআইএম-এর মতো তথাকথিত এলিট অরাজনৈতিক শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন জেএনইউ-এর প্রতি সংহতি জানিয়ে, এটাই জানিয়ে দিচ্ছে যে এই ছাত্রবিক্ষোভ এক নতুন ভারতবর্ষ। যে ভারতবর্ষ প্রতিটা গ্রাম মফস্বল ও শহরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিচ্ছে যে বিজেপি-ই শেষ কথা নয়, শেষ কথা নয় হিন্দুরাষ্ট্রও। তার পরেও শেষ কথা বলবে ইতিহাস। ভারতের প্রতিটা কোনায়, প্রতিটা ইঞ্চিতে যেখানেই একজনও ছাত্র আছে, সেই ইঞ্চিটাকেই তাই প্রতিরোধের জায়গা হিসেবে আমরা নির্দ্বিধায় শনাক্ত করে নিতে পারি। এই জাগ্রত ভারতবর্ষেরই অপর নাম ঐশী ঘোষ!

কাজেই হে অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ পাঠক, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে এই সম্পাদকীয় পক্ষ নিচ্ছে স্পষ্টত। সেটা উদারনৈতিকদের পক্ষ। বামপন্থীদের পক্ষ। বামেদের আপনার খুব অপছন্দ হতেই পারে, কিন্তু এই সম্পাদকীয় কিছুতেই ভুলিয়ে দেবে না এই সত্য যে ঐশী ঘোষ আসলে কমিউনিস্ট, যে কমিউনিস্টদের আপনি এতকাল অপছন্দ করে এসেছেন সংবাদপত্র টিভি-চ্যানেল এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির মধ্যে দিনযাপনের কারণে। এবং এই সত্যটাও ভুলিয়ে দেবে না যে কেরিয়ার, স্বচ্ছন্দ জীবন, উজ্জ্বল চাকরির হাতছানি ত্যাগ করে আপনাদের ছেলেমেয়েরা যখন রাত জাগছে, স্ট্রিট ফাইট করছে রাষ্ট্রের সঙ্গে, মাথায় রডের বাড়ি খেয়েও হাসপাতাল থেকে ফিরে আসছে রণক্ষেত্রে, তখন তাদের সেই গাদাবন্দুক প্রচেষ্টার মধ্যিখানেই আপনি নিশ্চিন্ত ভাতঘুম গিয়েছেন, অফিস করেছেন, তর্ক করেছেন যে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে আসতে দেওয়া উচিত কি না, অথবা সমস্ত রাজনৈতিক দলই যে কত খারাপ সেই মত প্রচার করেছেন জোর গলায়। নিশ্চিন্ত থাকুন, আগামী প্রজন্ম আপনাকে জিজ্ঞাসাও করবে না যে তারা যখন রাষ্ট্র বাঁচাবার জন্য রাত জাগছিল, আপনি তখন কী করছিলেন। জিজ্ঞাসা করবে না, কারণ আপনি, বিজেপি দলটির মতোই, ততদিনে গুরুত্বহীন এবং অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এই বিশ্বাসও শতকণ্ঠে বলবার যে বিজেপি হারবে। হারবেই। আজ না হলেও কাল, হারতে তাকে হবেই। ইতিহাসে কেউ স্থায়ী হয় না। দুঃখের কথা হল, নাজিবাহিনী যখন হেরেছিল, তাদের নেতা কর্মীদের বিচার হয়েছিল। বিচার হয়নি সেই লাখ লাখ জার্মানদের যারা নাজিদের সমর্থন করে অথবা নিরপেক্ষ সাজার ভান করে এই অন্যায়ের সামাজিক বৈধতা দিয়েছিল। কাজেই, হে অজাতশত্রু নিরপেক্ষ পাঠক, বিচার আপনারও হবে না।

একটি কার্টুন ছিল— এক মা ছেলেকে গল্প শোনাচ্ছেন। বলছেন যে সব গল্পের শেষেই স্বৈরাচারী শাসকের

পরাজয় হয়। শিশুটি জানতে চেয়েছিল যে যদি গল্পের শেষে স্বৈরাচারী শাসকের পরাজয় না হয় তা হলে? মা উত্তর দিয়েছিলেন যে তা হলে বুঝতে হবে গল্প এখনও শেষ হয়নি। ঐশী ঘোষেদের ভারতবর্ষের গল্প এখনও শেষ হয়নি। প্রতিরোধ যেখানে একমাত্র সত্য, তার আখ্যান অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকে। আরেকটি গল্পের কথা উল্লেখ করা খুব অসংগত হবে না। রমাপদ চৌধুরীর একটি গল্প। নাম 'ভারতবর্ষ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের একটা গ্রামে মিলিটারিরা আন্ডা হল্ট স্টেশনে সাধারণ মানুষদের দিকে খুচরো পয়সা ছুঁড়ত আর তা নেবার জন্য দলে দলে মানুষ মিলিটারিদের ট্রেনের দিকে প্রতি সকালবেলায় ছুটে যেত। একমাত্র গ্রামপ্রধান বাদে। সে সকলকে বাধা দিত। যেতে দিত না। বলত 'ওতে ইজ্জত নাই'। গল্পের শেষে, যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে, মিলিটারিদের শেষ ট্রেন যখন চলে যাচ্ছে, সেদিন দেখা গেল অন্য সকলের সঙ্গে সেই গ্রামপ্রধান বুড়োও ছুটে আসছে মিলিটারি ট্রেনের দিকে। খুচরো পয়সার জন্য দুইহাত বাড়িয়ে। রমাপদ লিখেছিলেন 'সেদিন সকলেই খুচরো পয়সা পেয়েছিল কিন্তু আমাদের গ্রাম খুব গরিব হয়ে গিয়েছিল'। যতদিন আমাদের কেউ দেশপ্রেমিক হতে বলেনি, আমরা নিজেদের অন্য অনেক দেশের মানুষদের তুলনায় খুব ভাগ্যবান এবং ঐশ্বর্য্যশালী মনে করেছি। তারপর একটা সময় এসেছিল যখন আমরা অনেকেই জাতীয়তাবাদী খুচরো পয়সা কুড়োতে ছুটে চলেছিলাম। আর আমাদের দেশও এক লহমায় খুব গরিব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আমাদের ভাণ্ডার উপচে দিচ্ছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, উপচে দিচ্ছেন দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষেরা। প্রত্যাখ্যানের বিনিময়ে যে এত সম্পদশালী হওয়া যায়, এর আগে কে জানত!

এই সম্পাদকীয় শেষ করবার সময়েই কাগজে খবর বেরিয়েছে, দিল্লি পুলিশ ঐশী ঘোষের বিরুদ্ধেই এফআইআর দাখিল করেছে। যারা রক্তাক্ত তারাই রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী। অমিত শাহের অঙ্গুলিহেলনে চলা দিল্লি পুলিশ যদি ঐশীকে গ্রেপ্তার করে তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখরিত হবে গোটা দেশ। ফ্যাসিবাদ বিরোধী বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত প্রতিরোধকে সালাম জানানোই এই সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য।

কল্পনাশক্তিহীনের স্বৈরাচার

মহান নাট্যব্যক্তিত্ব হাবিব তনভির রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের গুন্ডাদের হাতে বহুবার আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি এই আক্রমণের প্রেক্ষাপটে মানুষকে সাবধান করে একটি কথা বলতেন— 'Beware of the tyranny of the unimaginative'। অর্থাৎ, কল্পনাশক্তিহীনের স্বৈরাচার হইতে সাবধান। তিনি এই কথা বলতেন কারণ তিনি জানতেন যে সাংস্কৃতিক-নান্দনিক-সাহিত্যিক কোনো গুণ হিন্দুত্ববাদী শক্তির নেই। তাদের কল্পনাশক্তিহীন মোটা মাথাতে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান আসলেও, রামায়ণের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা তারা বোঝে না। শুধু মোটা দাগের হিন্দুত্বের অন্তঃসারহীন বাগড়ম্বর বাদে তাদের দেশকে দেওয়ার মতো কোনো সাংস্কৃতিক অবদান নেই। তাই খাজুরাহোর মন্দিরের নান্দনিক সৌন্দর্য না বুঝে তারা শুধুমাত্র মুসলিম বলে মকবুল ফিদা হুসেনের আঁকা সরস্বতী নিয়ে ভাঙচুর করে, সাহিত্য রস বঞ্চিত পাষণ্ডরা পুড়িয়ে দেয় পাঠাগার, মঞ্চে নাটক চলাকালীন আক্রমণ করে হাবিব তনভিরকে।

আজ হাবিব তনভির আমাদের মধ্যে নেই। তবু, তাঁর এই কথা কতটা সত্যি ছিল আজকের ভারতের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বর্তমানে নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি-র বিরুদ্ধে যেই প্রতিবাদ চলছে, তার অন্যতম কেন্দ্রস্থল জেএনইউ-র দিকে প্রথমে তাকান। ভেতরে নারকীয় হামলা চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা। আর বাইরে সমবেত হয়েছে আরএসএস মদতপুষ্ট আরেক শ্রেণির বহিরাগত। কী স্লোগান দিচ্ছে তারা— 'দেশকে গদ্দারো কো গোলি মারো সালো কো'! এর কয়েকদিন আগে দিল্লি শহরে নাগরিকত্ব আইনের পক্ষে মিছিল করল বিজেপি— এখানেও সেই এক স্লোগান, গুলি চালনার বাসনা, মানুষ খুন করার আহ্বান। পুলিশ যথারীতি নিরুত্তাপ।

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখুন নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রতিবাদী মিছিল ও সভার দিকে। একদিকে সগর্বে মানুষের হাতে হাতে উড়ছে জাতীয় পতাকা, গাওয়া হচ্ছে গান, পাঠ করা হচ্ছে কবিতা, আঁকা হচ্ছে ছবি, স্লোগান উঠছে আজাদি-র। এই প্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম, প্রতিবাদীদের মুখে গানগুলি শুনুন। 'জনগণমন অধিনায়ক' স্তবকটি শুধু নয়, গাওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ গানটি, যেখানে ভারতভাগ্যবিধাতার জয়গান

করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কলকাতা শহরে গাওয়া হচ্ছে 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা', 'আমরা করব জয়' ইত্যাদি গান। এবং দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নবজন্ম ঘটেছে ফ্যায়েজ আহমদ ফ্যায়েজ-এর। আইআইটি কানপুরের কিছু অর্বাচীন শিক্ষক নালিশ করেছেন যে ছাত্ররা ফ্যায়েজ আহমদ-ফ্যায়েজ-এর বিখ্যাত গজল 'হম দেখেঙ্গে' গেয়েছে, যেটি নাকি হিন্দু বিরোধী! এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য জ্ঞানী অধ্যাপকদের ধন্যবাদ দিতেই হয়। কারণ তাঁদের ফ্যায়েজ বিরোধী কথায় আবার জীবিত হয়ে গেছেন কালজয়ী কবি। আসমুদ্রহিমাচলে ধ্বনিত হচ্ছে 'হম দেখেঙ্গে', তাঁর কথায় মানুষ শপথ নিচ্ছেন সেই দিন দেখার যেদিন মসনদে বসবেন দেশের সাধারণ মানুষ। কীভাবে কবিরা ফিরে আসেন, কীভাবে একটি কবিতা তার সময়কে অতিক্রম করে বর্তমানের প্রতিবাদের ভাষা জোগায় তারই প্রমাণ ফ্যায়েজের 'হম দেখেঙ্গে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভারতভাগ্যবিধাতা'।

অন্যদিকে, প্রতিবাদীদের হাতের পতাকা আরো অনেক কথা বলে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মোদী এবং বিজেপি দেশে এক উগ্র-জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করেছে যেখানে সরকারকে প্রশ্ন করলেই তাকে দেশদ্রোহীর তকমা দেওয়া হচ্ছে। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদে বলীয়ান ব্যক্তিদের আমরা দেখেছি তেরঙা ঝান্ডা হাতে মিছিল করতে কাঠুয়ার ধর্ষকদের পক্ষে, এমনকী আখলাখের হত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জাতীয় পতাকায় মুড়ে শেষযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জাতীয় পতাকার লাগাতার অবমাননা করে গেছে মত্ত হিন্দুত্ববাদীদের দল। কিন্তু ছাত্রসমাজ এবং ভারতের জনতা এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন যে জাতীয় পতাকার অনেক অবমাননা আমরা সহ্য করেছি, আর নয়। তাই নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রত্যেকটি মিছিলে, সমাবেশে মাথার উপর উড়ছে তেরঙা ঝান্ডা। গাওয়া হচ্ছে জাতীয় সংগীত, পঠিত হচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনা। মানুষ তাদের নিজেদের হাতে তৈরি এই দেশ ও সংবিধানকে সরকারের হাত থেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। তাই মিছিলের ভিড়ে বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে আমাদের জাতীয় নায়কেরা— গান্ধী-আম্বেদকর-ভগৎ সিং-ক্ষুদিরাম ইত্যাদি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বোত্তম আদর্শকে পাথেয় করে পথ হাঁটছেন দেশের মানুষ।

উলটোদিকে দাঁড়িয়ে লাঠি হাতে মুখোশ পরা কিছু ব্যক্তি যারা তর্ক-বিতর্ককে গায়ের জোরে সমাধান করতে চায় কারণ তাদের বলার মতন কোনো যুক্তি নেই, unimaginative বলেই যুক্তি-তর্কে পেরে উঠতে পারছে না, পুলিশ ও ভাড়াটে গুন্ডার সাহায্যে রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান করতে চাইছে যেখানে পথে নেমেছেন লাখো মানুষ। অন্যদিকে নান্দনিকতার রসে বঞ্চিত হিন্দুত্ববাদীরা কোনো প্রতীক হাজির করতে পারছেন না ভারতের মানুষের সামনে যা হিংসাশ্রয়ী নয়। বরং 'গোলি মারো সালো কো' জাতীয় স্লোগান তুলে তাঁরা প্রমাণ করছেন যে হিংসার ভাষা ছাড়া তাদের আর কোনো ভাষা নেই। দেশের মানুষকে ঠিক করতে হবে তারা কল্পনাশক্তিহীন একটি বর্বর শক্তির সঙ্গে থাকবেন নাকি নান্দনিকতা, গান, কবিতা, স্লোগান ও স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শে বলীয়ান দেশের ছাত্রসমাজ ও নাগরিকত্ব আইন-এনআরসি বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভারতের সংবিধানকে বাঁচাবেন।

সমসাময়িক

ছি

অলিভার ক্রমওয়েল-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিরূপে আপনাকে গর্বের সঙ্গে দেখার জন্য এত মানুষ যে ভিড় করেছে, তার জন্য কি আপনি গর্বিত বোধ করছেন না?

ক্রমওয়েলের উত্তর ছিল: এর চেয়ে তিন গুণ বেশি মানুষ আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখার জন্য অপেক্ষা করবে।

ফ্রয়েডকে তাঁর আকস্মিক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুনিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক রাজা অলিভার ক্রমওয়েল-এর বয়ান। নিজেদের সম্পর্কে এমন নির্মোহ মূল্যায়ন অন্তত ইতিহাসে থাকবে।

জ্যোতি বসুকে এক বিশিষ্ট সম্পাদক প্রশ্ন করেছিলেন, ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা নিয়ে, তিনি বলেছিলেন, ইতিহাসের ফুটনোটেও জায়গা হবে না।

আসলে অনেকে বোঝেন না তাঁর বা তাঁদের অবস্থান। মানুষ কোনো বিশেষ দল বা ব্যক্তিকে নয় ভালোবাসে এক আদর্শ, এক বিশেষ নৈতিক অবস্থান বা বিষয় বা ইস্যুতে এবং সেটা নিঃশর্ত আদপেই নয়। ব্যক্তি বা দল অবস্থান বদলালে মানুষ-ও অবস্থান বদলাতে বাধ্য হয়। কষ্ট বুকে নিয়ে। ভুল বিশ্বাসের কষ্ট যত না, তার চেয়ে বেশি যাঁকে বা যে দলকে বিশ্বাস করেছিল, তিনি বা তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট বলে। তত্ত্ব ছাড়া মানুষ নয়। মানুষ ছাড়া তত্ত্ব নয়। এই সহজ সত্য কথাটা অনেকেই মনে রাখেন না অথবা ক্ষমতা মদমত্ততায় ভুলে যান।

একসময় হিটলার ভেবেছিলেন তিনি মানেই জার্মানি। ভৃত্যকুল বুঝিয়েছিল, তিনি মানেই দুনিয়া! হিটলারের সমান কোনোভাবেই নন, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীও একসময় ভেবেছিলেন, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া। তল্পিবাহক এত বেশি ছিল। দলের সভাপতিও তাই ভেবেছিলেন। পরে তিনিই ইন্দিরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রবল প্রবলতর বিরোধী।

এখন মোদীও তাই ভাবছেন। ভাবছেন দলের সভাপতি অমিত শাহ। প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী। লোকে বলে, দেড় ব্যাটারি সরকার। কে হাফ কে ফুল— দুর্জনে জানে।

এখন এমন অবস্থা ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশে যেতে পারেননি কাগুজে লৌহ (মরচে) মানুষ অমিত শাহ। ১৯ ডিসেম্বর ঢুকতে পারেননি নিজের রাজ্য গুজরাট। মোদী দু-দুবার বাতিল করতে বাধ্য হলেন আসাম সফর। ১৬ ডিসেম্বর ও ১০ জানুয়ারি।

১১ জানুয়ারি আসতে সাহস করলেন পশ্চিমবঙ্গে। কেন? সে কি সেটিং? সে কি বাকি বিরোধী দলকে দুর্বল ভাবা? নাকি ভুল/সঠিক গোয়েন্দা রিপোর্ট। তেমন কিছুই হবে না!

বিক্ষোভ হয়। শহর জুড়ে। বাম ডান সব মোদী বিরোধীই পথে নামেন। কংগ্রেস তো নেতাজি ইন্ডোরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। আরএসএফের ছাত্রকর্মীরা বাগবাজার ঘাটে বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে পরে ছাড়া পান। ধর্মতলায় সারা রাত জাগেন কয়েক শত ছাত্রছাত্রী, দু-একজন অধ্যাপক, কিছু এনআরসি বিরোধী যুব ও প্রবীণ। টানা পঁচিশ ঘণ্টা চলে অবস্থান। বিমানবন্দরে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা রুখে দেয় পুলিশ। কারো বাড়িতেও গেছে আপত্তি ভয় দেখাতে। কৈখালিতে পথ অবরোধ হয়েছে। মোদীকে পথ ও স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। আকাশ ও জলপথ ব্যবহার করেছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রানি রাসমণি রোডে অবস্থান মঞ্চ করে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসার আগে ও পরে যান। সেখানে গিয়ে নকশালপন্থী ও দলহীন কয়েক শো ছাত্র ছাত্রী বিক্ষোভ দেখায়। এটা নজিরবিহীন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করে তাঁর বক্তব্য জানান। বক্তব্যের নির্যাস এই যে, তিনি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যদিও তিনি এনআরসি এবং ক্যা-এর বিরোধিতা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার কথাও তিনি বলেন।

যাই বলুন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় দিল্লিতে বিরোধী জোটের সভায় না গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পদক্ষেপ নিয়েছেন যা তাঁর ২০০৬ পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ততটা মানানসই নয়।

তিনি কি ভাবছেন, তিনি মানেই পশ্চিমবঙ্গ? যা বলবেন, তাই হবে? যা করবেন, তাকেই লোকে দু হাত তুলে সমর্থন করবে? ভুল। মহাভুল। হিমালয়ান ব্লান্ডার।

বামফ্রন্টকে দু হাত তুলে ভোট দিয়েছিলেন মানুষ ২০০৬-এ। কিন্তু জয়ের পরদিন টাটার সঙ্গে বামপন্থী দুই মন্ত্রীর সহাস্য মুখ আলিমুদ্দিনে, মানুষ কষ্ট পেয়েছিলেন।

তারপর শপথের সাত দিন সিঙ্গুরে বের হল ঝাঁটা। তবু শিক্ষা হল না। নন্দীগ্রামে গুলি চলল। মানুষ সরলেন পাশ থেকে। আর এখন কমতে কমতে ৫৩ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে কোথাও কোথাও ২.৫ শতাংশ।

মমতা ৪২ এ ৪২ আশা করেছিলেন। মিলল ২২। লোকসভায়। প্রথম ছয় দফায় ৩৩ আসন। পান ১৩টি। শেষ দফায় ৯টি। সবকটি পেলেন। বিজেপি ০। ৬ দফায় ১৮ আসন। শেষ দফায় ০। কেন? বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার পর উদার বাম (লেফট লিবারাল) এবং সংখ্যালঘুদের একটা বড়ো অংশ সমর্থন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে।

যত না নীতিগত। তার চেয়ে বেশি বিজেপিকে হারানো। আসলে মানুষ ভোট দেয় যত না কাউকে জেতাতে তার থেকে বেশি কাউকে হারাতে। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে করিমপুর, খড়গপুর, কালিয়াগঞ্জ জিতেছে। তার কারণ বাম ভোটারদের একটা অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে তৃণমূলে দিয়েছেন এনআরসি আতঙ্কে। মূল্যবৃদ্ধি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে।

এরপর ১১ ডিসেম্বর পাস হল ক্যা আইন। আসাম মণিপুর মেঘালয় অরুণাচল জ্বলল। দিল্লির জামিয়া মিলিয়ার ছাত্র ছাত্রীদের ওপর তীব্র অত্যাচার। প্রতিবাদ দেশ জুড়ে।

পশ্চিমবঙ্গেও তীব্র প্রতিবাদ। আইন পাশের ৭ দিন পর মমতা নামলেন পথে। পরপর ১০ দিন মিছিল, পদযাত্রা রাজ্য জুড়ে।

এরপর ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হল পরিবর্তন। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বন্ধে সবাইকে আসতে হবে বললেন। বন্ধ ব্যর্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি সফল হলেন না।

তারপর তাঁর আগ্রহে ডাকা সমস্ত বিরোধী দলের বৈঠক বয়কট করলেন। রাজ্যে সিপিএম এবং কংগ্রেস নাকি গুন্ডামি করেছে। এরপর নাটকীয় পালটি। মোদীর সঙ্গে বৈঠকে। ভাবা যায়। এতে তাঁর লাভ কতখানি তিনি জানেন। দেশের ও জনগণের স্বার্থে আঘাত। সর্বনাশ।

এর মধ্যে নরেন্দ্র মোদী কলকাতা বন্দরের নাম পালটে ফেলেছেন। বিবেকানন্দের জন্মদিন ও বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসির দিনে, কলকাতা বন্দরের নামকরণ করা হল, বাংলা ভাগের নায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হওয়া উচিত। ব্যক্তির নামে কেন? কলকাতা বন্দর, কলকাতাই থাক।

মোদী তো থামার পাত্র নন। গেছেন বেলুড়ে। বিক্ষোভের ভয়ে রাজভবনে রাত কাটাতে সাহস করেননি। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে বিবেকানন্দের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ভাষণ দিয়েছেন। বলেছেন, ক্যা ও এনআরসি নিয়ে কথা। সাধারণ দর্শকরা তাঁর জন্য দু ঘণ্টা ঢুকতে পারেননি। সেজন্য মিশন কর্তৃপক্ষ কোনো দুঃখপ্রকাশ করেননি। উলটে মোদীকে পাওনার লোভে শংসাপত্র দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুবীরানন্দ বলেছেন, দেশের অন্যতম সেরা প্রধানমন্ত্রী মোদী।

লজ্জার কথা। যেন মোদী, মোদীর জমানায় গোধরা ঘটেনি, ২০০০ নারী গণধর্ষিতা ও ৩০০০ জন মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খুন করা হয়নি। মাসাধিককাল ধরে বিনা বাধায়, খাদ্যাভ্যাসের জন্য পিটিয়ে মারা হয়নি ৫৩ জনকে, কোটি কোটি মানুষকে উদ্‌বাস্তু করার চেষ্টা হয়নি, ডিটেনশন ক্যাম্পে ২৯ জনকে খুন করা হয়নি, ১০২ বছরের কাউকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হয়নি, প্রতিদিন ৯১ জন ধর্ষিতা হননি, ২৭টি সরকারি ব্যাঙ্ক ১২টি হয়ে যায়নি। ব্যাঙ্ক প্রায় দেউলিয়া হতে হয়নি, লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে দোস্তদের দেশ ছেড়ে পালানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়নি, লাভদায়ক সরকারি সংস্থাগুলোকে পেটোয়া করপোরেট আদানি আম্বানিদের কাছে বেচে দেওয়া হয়নি, ৫ কোটি মানুষ নোট বন্দি জিএসটির কারণে কাজ হারাননি, ৬৪ হাজার সাধারণ পদের জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ সুশিক্ষিত বেকার আবেদন করেননি। ১২৮টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধ হয়ে যায়নি। আরো বেদনার কথা, এক সন্ন্যাসী(!) বলেছেন, মোদী আমাদের ঘরের ছেলে! রামকৃষ্ণ মিশনের ঘরের ছেলেরা বুঝি এমন হন?

এখন মনে পড়ে উনিশ শতকের কথা।

গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া
মেঘনাদবধ কাব্যে

এই উচ্চারণের পাশাপাশি মধুসূদন বাঙালি জাতিসত্তা জাগরণ প্রকল্প হিসেবেই যেন মকরাক্ষের বয়ানে উপস্থাপিত করছেন: পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।

পিঠে অস্ত্রের দাগ বহন আর করবে না বাঙালি। লড়বে সে যে যেমন ভাবে পারে তাই। তাই কিছু দাস মনোভাব থেকে ইংরেজ ভজনায় ব্যস্ত, আর কিছু লেখক সাহিত্যিক শারীরিক অস্ত্র ধরতে না পারলেও হাতে তুলে নিচ্ছেন কলম, তরবারির চেয়েও শক্তিশালী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে অস্ত্র।

আজকের লেখক শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজকর্মী সাংবাদিকদের সেই দায়। পথে এবং লেখায় ধ্বনিত হোক সংগ্রামী রণধ্বনি: কিছু না পারেন— অন্তত ছি বলুন।

পুনশ্চ: বিপদ, মহাবিপদ সামনে। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে

তিনটি আসনে উপনির্বাচনে হেরেছে। কিন্তু তাদের ভোট শতাংশ কমেনি, কমেছে বামপন্থীদের। ভোট কাটাকুটিতে বিজেপির লাভ হচ্ছে। বিজেপির ভোট কমছে না। ওরা ঘরে ঘরে যাচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপে নিরন্তর প্রচার চালাচ্ছে। এবং মনে রাখবেন, ১১ এবং ১২ জানুয়ারি মোদী বিরোধী বিক্ষোভে জনজোয়ার কিন্তু নামেনি ১৯ ডিসেম্বরের মতো।

শুধু লিখে সভা সমিতিতে হবে না। নিরন্তর সতর্ক প্রচার জরুরি। না হলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

উপত্যকায় আংশিক স্বস্তি

অবশেষে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলল অবরুদ্ধ জম্মু-কাশ্মীরে। গত ৫ অগস্ট ৩৭০ ধারা রদের পর বিক্ষোভ সামলাতে কার্যত কাশ্মীর উপত্যকা জুড়েই ১৪৪ ধারা জারি হয়েছিল। এখনও শ্রীনগর-সহ অনেক জায়গায় ১৪৪ ধারা রয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালত অবশেষে রায় দিয়েছে, বারবার ১৪৪ ধারা জারি করা ক্ষমতার অপব্যবহার এবং যুক্তিসংগত মত প্রকাশ ও বিক্ষোভ রুখতে ১৪৪ ধারা জারি করা চলে না। তবে ইন্টারনেট বন্ধ বা ১৪৪ ধারা জারির রাজনৈতিক যৌক্তিকতা বিচারপতি এন ভি রমণের নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের বেঞ্চ বিচার করতে চায়নি। এতদিন ইন্টারনেট বন্ধ বা ১৪৪ ধারা জারির সমস্ত নির্দেশই গোপন রাখা হত। সরকার যুক্তি দিয়েছিল, বিধিনিষেধের ব্যাপারটা পুলিশ-প্রশাসন-সেনার উপরে ছেড়ে দেওয়া হোক। আদালত আজ স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই ধরনের নির্দেশ সংবিধানের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে, কারণ ইন্টারনেট ব্যবহার কাশ্মীরের মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। বিচারপতিরা এ-ও জানিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করার অনুমতি দেওয়া যায় না। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা মারফত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে আদালত বলেছে, এ ধরনের প্রতিরোধমূলক নির্দেশকে নাগরিকদের আইনি মত প্রকাশ রোধ করার হাতিয়ার করে তোলা যায় না। জম্মু কাশ্মীর সরকার বলেছিল, ১৪৪ ধারা বলবৎ করার নির্দেশ আদালত পরীক্ষা করতে পারে না। এ সওয়াল খারিজ করে দিয়েছে আদালত। আদালত রাজ্য সরকারকে আদেশ দিয়েছে, রাজ্যের যে সমস্ত নির্দেশের ফলে নাগরিকদের জীবনে প্রভাব পড়তে পারে, সে সব নির্দেশই প্রকাশ করতে হবে, যাতে নাগরিকেরা সে নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ দেওয়ার সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সংবেদনশীল হতে বলেছে আদালত। বলা হয়েছে, তাঁরা যেন নিরাপত্তা ও নাগরিকদের স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন। আদালত বলেছে, সংবেদনশীল না হয়ে এ ধরনের নির্দেশ জারি করলে মৌলিক অধিকার খর্ব হবে।

তবে এই রায়ের ফলে যে সঙ্গে সঙ্গেই ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়ে যাবে, এমন নাও হতে পারে। এরপরও কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকার দেশের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলার ঝুঁকির কথা বলে ইন্টারনেট বন্ধ বা ১৪৪ ধারা জারি করতে পারে। কারণ, বর্তমান নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারির সুযোগ থাকছেই। এই রায়ে কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিও বা কতটা বদলাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। কারণ, তিন বিচারপতির বেঞ্চ আজ শুধুমাত্র কাশ্মীরের ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল ও সরকারি পরিষেবায় অবিলম্বে ইন্টারনেট চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। সমস্ত ইন্টারনেট চালু করার নির্দেশ দেয়নি। সব জায়গা থেকে ১৪৪ ধারা তোলারও নির্দেশ দেয়নি আদালত। তবে তা চালিয়ে যাওয়ার দরকার রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলেছে।

কিন্তু এই রায় গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই প্রথম সুপ্রিম কোর্ট জম্মু কাশ্মীরের অবস্থা নিয়ে মুখ খুলল। এ ছাড়াও, এই প্রথমবার সুপ্রিম কোর্ট ইন্টারনেট অ্যাকসেসকে সংবিধানের ১৯ (১) (এ) এবং ১৯ (১) (জি) অনুচ্ছেদের অংশের অন্তর্বর্তী হিসেবে দেখেছে। প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টি মত প্রকাশ ও কথা বলার অধিকার, দ্বিতীয়টি যে-কোনো পেশা বা ব্যাবসার অধিকার। এর আগে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেরালা হাইকোর্ট ইন্টারনেট অ্যাকসেসকে মৌলিক অধিকার বলে রায় দিয়েছিল।

৩৭০ ধারা রদ করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একগুচ্ছ মামলার শুনানি ২১ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে হবে। তার আগে এই রায় কিছুটা হলেও মেঘ কাটাতে পারে অবরুদ্ধ উপত্যকায়। কারণ এই রায়ে যেটা লাভ হল, এবার থেকে যে-কোনো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি বা ইন্টারনেট বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে। এ ছাড়াও সামগ্রিকভাবে সিএএ-এনআরসি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রুখতে বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি বা ইন্টারনেট বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রকাশ করা ও কারণ দেখানোর জন্য পুলিশ-প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করা যাবে কিছুটা।

তবে ইন্টারনেট পরিষেবা ফের শুরু হতে চললেও ভূস্বর্গের অনেক রাজনৈতিক নেতাই এখনও গৃহবন্দি। যাঁদের মধ্যে

রয়েছেন তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি এবং পিতা-পুত্র ফারুক ও ওমর আবদুল্লা। এ ছাড়াও, যে প্রশ্নটা থেকেই যায়, তা হল কাশ্মীরে আমজনতার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা কবে চালু হবে? কারণ দেশের নিরাপত্তা, বিপদ বা হামলার সম্ভাবনার যুক্তি দেখিয়ে ইন্টারনেট বন্ধ বা ১৪৪ ধারা জারির সুযোগ কি থেকে যাচ্ছে না?

তবে আশার কথা এটাই যে এবার কিছুটা হলেও হয়তো জানা যাবে যে কাশ্মীরে আসলে ঘটছেটা কী। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার রিপোর্ট বরাবর দাবি করে এসেছিল যে উপত্যকা শান্ত-স্বাভাবিক। সেই দাবি যে কতটা অসার, সেটা তারা নিজেরাই দেখিয়ে দিয়েছে। শান্ত স্বাভাবিক অঞ্চলে ইন্টারনেট বন্ধ করে রাখার দরকার পড়ে না। সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে এটা কার্যত জোর করে শান্তি বজায় রাখার শামিল ছিল। এবং এই একই পদ্ধতি সরকার প্রয়োগ করছিল অন্যত্রও। এনআরসি, সিএএ বিরোধী আন্দোলনে মুখর শহরগুলিতে নেট বন্ধ করে দিয়ে বস্তুত আন্দোলনকেই বলপূর্বক বন্ধ করে দেওয়ার এই অভিসন্ধি প্রশাসনিক নয়, মূলত রাজনৈতিক। এবং এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল পুলিশ, ব্রডব্যান্ড সংস্থা, তথ্যসংস্থার মতো প্রশাসনিক ও সরকারি স্তম্ভগুলি। শীর্ষ আদালতের এই রায় কি তা হলে বিজেপি-র স্বৈরাচারকে কিছুটা হলেও প্রতিহত করবে? সময়ই সেই উত্তর দেবে। তবে আজকাল সোসাল মিডিয়া ব্যবহার করে যেভাবে দ্রুত বিক্ষোভ সংগঠিত করা হচ্ছে, শুধু ভারতেই নয়, শাহবাগ থেকে শুরু করে তেহরান বা ইজিপ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী বিক্ষোভে ইন্টারনেটের ক্ষমতা, সেক্ষেত্রে এই রায় বিজেপি-র মাথাব্যথা কিছুটা বাড়িয়ে দিল নিঃসন্দেহে।

ইরান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত

নতুন বছরের সূচনালগ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ফোনে বাক্যালাপ হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়। সরকারি বয়ানে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে দুই রাষ্ট্রপ্রধান দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরালো করার কথা বলেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুই দেশের স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেই সব ক্ষেত্রে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে চান। আর গত কয়েক বছরে দুই দেশের সম্পর্ক যেভাবে আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সম্পর্ক আরো উন্নত করতে হবে। কিন্তু মোদী-ট্রাম্প কথা হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন মার্কিন ড্রোন হানায় প্রতিবেশী দেশ ইরাকের মাটিতে ইরানের কাডস বাহিনীর প্রধান কাসেম সোলেমানির মৃত্যু হয়েছে এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যত যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে দুই নেতার আলোচনায় ইরান প্রসঙ্গ আসাটা স্বাভাবিক।

ভারতের কাছে ইরানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাটা খুবই জরুরি। কারণ, এর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ রয়েছে। ইরান ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে চা, চাল ও অন্য অনেক পণ্য নেয়। ইরান থেকে তেল পাওয়াটা ভারতের কাছে খুবই জরুরি।

ইরানের চাবাহার বন্দরে বিপুল বিনিয়োগ, ইরানের সহায়তায় পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান-সহ পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানো, পরে ইরান থেকে আবার তেল আমদানির রাস্তা খুলে রাখার মতো বিষয়গুলি ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা এইসব বিষয়ে অবহিত। ইরান ও ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাও সর্বজনবিদিত। তাই ইরানকে বিশ্বে একঘরে করে দেওয়ার যে প্রকল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাতে নিয়েছে, তাতে নয়াদিল্লিকে তেহরানের থেকে দূরে এবং বিচ্ছিন্ন রাখাটা হোয়াইট হাউসের কাছে জরুরি।

ইরান থেকে ভারতের তেল আমদানি প্রায় শূন্যে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি সৌদি আরবের উপর নির্ভরতা বাড়ানোর প্রয়াস জারি আছে। সৌদি আরবের সবচেয়ে বড়ো তেল সংস্থা আরামকো-কে ভারতে বিনিয়োগ করার বন্দোবস্ত হয়েছে। অনেকের ধারণা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড বা বিপিসিএল-এর বি-রাষ্ট্রীয়করণ 'আরামকো'-র স্বার্থেই করা হচ্ছে।

অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভিত্তিক এই কূটনীতিতে ভারত ও আমেরিকা নিজেদের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাতার নীচে জায়গা খুঁজে নিতে ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সোলেমানিকে 'জঙ্গি' আখ্যা দিলেও আদতে তিনি ইরানি সেনাবাহিনীর অন্যতম শীর্ষকর্তা এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও সে দেশের ধর্মগুরু আলি খামেনেইয়ের পরেই তাঁর স্থান ছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি কাডস বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। বিদেশের মাটিতে ইরানপন্থী বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের পরিচালনা করাই ছিল তাঁর কাজ। তাঁর মদতেই সিরিয়ার বাশার আল আসাদ সরকার আইএস দমনে সফল

হয়েছে। তা ছাড়া, তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সোলেমানির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এহেন সেনাকর্তার নিধনে ইরানের সরকারি স্তরে তো বটেই, সাধারণ মানুষের মধ্যেও আমেরিকা-বিরোধী মনোভাবে ঘি পড়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই জেনারেল কাসেম সোলেমানিকে 'জঙ্গি' বলে আসছে। পক্ষান্তরে মার্কিন সেনাবাহিনীকেই 'জঙ্গি' বলে আখ্যা দিয়েছে ইরানি পার্লামেন্ট। ইরান রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের কাডস ফোর্সকে অতিরিক্ত কুড়ি কোটি ডলার দেওয়ার কথাও পার্লামেন্টের বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

ইরান বদলা নেওয়ার চেষ্টা করলে, সেখানে বাছাই করে রাখা '৫২ টার্গেট' গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর জবাব দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট। 'ইরানকে ভয় দেখালে ভুগতে হবে' বলে তাঁর টুইট, 'যারা ৫২-র হুমকি দিচ্ছে, তারা যেন ২৯০ সংখ্যাটা ভুলে না যায়!' ১৯৭৯-তে ইরান-বিপ্লবের সময়ে মার্কিন দূতাবাসে বাহান্ন জনকে টানা চারশো চুয়াল্লিশ দিন পণবন্দি করে করে রাখা হয়েছিল। ইরানকে হুমকির মুখে রেখে সেই স্মৃতিই উশকে দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ইরানের প্রেসিডেন্ট এই প্রসঙ্গে ১৯৮৮ সালে ইরানি বিমানের উপর মার্কিন আঘাতে দুশো নব্বই জনের মৃত্যুর ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

ইরানের যে বাহান্নটি এলাকাকে লক্ষ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেছে নিয়েছে তার মধ্যে ছাব্বিশটি ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য। বরাবরই দেখা গেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন যেখানে আক্রমণ হানে সবার আগে ঐতিহ্যবাহী এলাকা বা স্থাপত্যকে ধ্বংসের জন্য বেছে নেয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরের উজ্জ্বল উপস্থিতি সর্বজনস্বীকৃত। একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে ইরাক আক্রমণের সময় রীতিমতো হিসেব কষে বাগদাদের সুপ্রাচীন স্থাপত্যগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ইরাকের অন্যান্য প্রাচীন জনপদগুলিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় মার্কিন ফৌজ উপস্থিত হওয়ার পর একবিংশ শতাব্দীতেই হারিয়ে গেল হাড্ডা শহর। আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের দশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত হাড্ডা শহরের বয়স কমবেশি বাইশশো বছর। গ্রিক ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এই প্রাচীন শহর থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খুঁজে পাওয়া যায় প্রায় তেইশ হাজার মূর্তি-স্থাপত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণে হাড্ডা হারিয়ে গেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ শহরটির কোনো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়নি। অনেকের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন স্থাপত্যকলার ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ায় একই ঘটনা ঘটেছিল। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার অনেক আগে থেকেই ইয়োরোপের ঔপনিবেশিকরা ধ্বংস করেছিল দুই আমেরিকা মহাদেশের সমস্ত প্রাচীন ও মহান ঐতিহ্য। ১৯৫৪-র দ্য হেগ কনভেনশন মোতাবেক অনুসারে, সামরিক অভিযানের পরিস্থিতি তৈরি হলেও যে-কোনো মূল্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতেই হবে, এই ঘোষণাকে কেমন যেন পরিহাস বলে মনে হয়। এইভাবে সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর হয়তো আগামী শতাব্দীতে রচিত ইতিহাসে লেখা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো দেশেই সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি।

এরমধ্যেই খবর পাওয়া যায় ৯ জানুয়ারি ইরানের বিদেশমন্ত্রীর রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যোগ দেওয়া আটকে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব জানিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রীর ভিসা আটকেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অথচ ১৯৪৭-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের 'সদর দফতর চুক্তি' অনুযায়ী রাষ্ট্রপুঞ্জে আমন্ত্রিত বিদেশি কূটনীতিকদের ভিসা দিতে বাধ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন বিদেশ দফতর এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। মুখে কুলুপ এঁটেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখপাত্র। ইরান-আমেরিকা টানাপড়েনের জেরে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব। তাঁর কথায়, 'ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এই শতাব্দীতে চরম আকার নিয়েছে। ক্রমাগত তা বেড়েই চলেছে। ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা। টালমাটাল দুনিয়া— এরই মধ্যে নতুন বছর শুরু হয়ে গেল।'

বাস্তবে বোধহয় একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইরাকে মার্কিন সেনার ব্যবহৃত সেনাঘাঁটি লক্ষ করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল ইরান। ৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে আল আসাদ এবং ইরবিলে মার্কিন সেনা ও যৌথবাহিনীর দুটি সেনাঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়। তবে এতে কত জন প্রাণ হারিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতিই বা কত, তা এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। যদিও আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। হামলার পরে সংবাদ মাধ্যমে তিনি জানান, 'ওই দুই সেনাঘাঁটি থেকে আমাদের নাগরিক এবং আধিকারিকদের লক্ষ করে হামলা চালানো হচ্ছিল। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের ৫১ নম্বর ধারা মেনে আত্মরক্ষার তাগিদে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করতে চাই না। কিন্তু যে-কোনো রকম আগ্রাসন প্রতিহত করতে প্রস্তুত আমরা।'

কাসেম হত্যার বদলা নিতে এলে ফল ভালো হবে না বলে দিন কয়েক আগেই তেহরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ইরানের তরফে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেননি তিনি। তবে গোটা বিশ্বের মধ্যে মার্কিন বাহিনীই যে

সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুসজ্জিত ফের একবার তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। জবাবে তেহরানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খামেনেই জানিয়েছেন, 'গত রাতে সপাটে থাপ্পড় কষিয়েছি। তবে শুধুমাত্র সামরিক আক্রমণই যথেষ্ট নয়, সমগ্র পশ্চিম এশিয়া থেকে আমেরিকার বিষাক্ত উপস্থিতি মুছে ফেলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় ইরাক আগের মতো তাদের অনুগত হয়ে থাকুক, যাতে ইরান এবং সৌদি আরবের মতো একটি তেল-সমৃদ্ধ দেশের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকে এবং সময় মতো যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গুন্ডা বলেও উল্লেখ করেন খামেনেই। তাই পরমাণু নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাওয়ার প্রশ্ন নেই বলে জানিয়ে দেন তিনি।

সোলেমানি হত্যার পরে ভারত যে সাবধানি বিবৃতিটি দেয় তাতে ঘটনার নিন্দা ছিল না। আবার সোলেমানি সম্পর্কেও কোনো নেতিবাচক শব্দ অনুপস্থিত। এর পরেই স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট দিল্লিতে এক জঙ্গি হামলার সঙ্গে কাসেম সোলেমানির যোগকে তুলে ধরে টুইট করেন। ভারত কিন্তু তাতে টুঁ শব্দও করেনি। সবমিলিয়ে ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে এগোতে শুরু করেছে সেক্ষেত্রে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' বলে দিন কাটানোর দিন ফুরিয়ে আসছে। ভারতের পক্ষে এ এক কঠিন সময়।

সময় কঠিন হওয়ার আরো একটা কারণ রয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে। তার সঙ্গে যদি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে খনিজ তেলের দাম বাড়তে শুরু করে তবে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে এবং আর্থিক বৃদ্ধির হার আরো নিম্নগামী হবে। ইরানকে কেন্দ্র করে মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হলে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি। তাই এই যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভারতকে চেষ্টা করতে হবে।

আজীবন সদস্য

অচ্যুৎ মজুমদার
অজয় মেহতা
অদিতি মেহতা
অনন্তরামন বৈদ্যনাথন
আনবিকা গঙ্গোপাধ্যায়
অনীতা সেন
অঞ্জনকুমার দাস
অপূর্ব কর
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
অভিজিৎ সেন
অমিতকুমার রায়
অমিয়কুমার বাগ্‌চী
অরুন্ধতী দত্ত
অলকানন্দা পটেল
অলোককুমার ভট্টাচার্য
অশোক মিত্র (প্রয়াত)
অশোকনাথ বসু
আজিজুর রহমান খান
ইমানুল হক
উজ্জ্বলা দাশগুপ্ত
উৎসা পট্টনায়ক
ঋতা মজুমদার
একরামুল বারি
কুমারদেব বোস
কুণাল বসু
গোপা সামন্ত
গৌতম নওলখা
চন্দ্রশেখর বসু
চারুসীতা চক্রবর্তী
জয়তী ঘোষ
জর্জ রোজেন (প্রয়াত)
জিতেন্দ্র পাচাল
জ্যোতির্ময় ঘোষ (প্রয়াত)
ডলরেস চিউ
ডালিয়া ঘোষ
তরুণ সরকার
তাপস চক্রবর্তী
তাপসী দাস
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
তৃষিতানন্দ রায়
ত্রিদিব ঘোষ
দিগন্তিকা পাল
দীপাঞ্জন গুহ
দীপককুমার ঘোষ
দীপঙ্কর সেনগুপ্ত
ধৃতিকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী (প্রয়াত)
ধ্রুবনারায়ণ ঘোষ
নিদাদাভেলু কৃষ্ণাজি
নির্মলকুমার চন্দ্র (প্রয়াত)
পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা
পরিমল ভৌমিক
পানু ভট্টাচার্য
পি কে গুহঠাকুরতা
পীযূষ চক্রবর্তী
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রদীপ ঘোষ
প্রভাত পট্টনায়ক
ফ্রাঁস ভট্টাচার্য
বারীন রায়
বাসন্তী সাহা
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য
বিজয়া গোস্বামী
বিপ্লব নায়েক
বিভাস সাহা
মইদুল ইসলাম
মল্লিকা আকবর
মানবী মজুমদার
মালিনী ভট্টাচার্য
মিতা পোদ্দার
মিহির ভট্টাচার্য
মীনা সেনগুপ্ত
মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি
যশোধরা বাগচী (প্রয়াত)
রজতকান্তি সিংহ চৌধুরী
রমণীকান্ত সরকার
রঞ্জন গুপ্ত (প্রয়াত)
রাজশ্রী দাশগুপ্ত
রাহুল সিংহ
রীনা শর্মা
রূপক দাস
ললিতা চক্রবর্তী
শর্বরী দাশগুপ্ত
শর্মিলা চন্দ্র
শান্তনু বসু
শিবানী রায়চৌধুরী
শ্যামল ভট্টাচার্য
শ্রীদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপর্ণা মিত্র
শ্রীলতা ঘোষ
সব্যসাচী বাগ্‌চী
সমরাদিত্য পাল
সত্রাজিৎ দত্ত
সুকন্যা মিত্র
সুজিত পোদ্দার
সম্বুদ্ধ পোদ্দার
সুনন্দা সেন
সুভাষ ভট্টাচার্য
সুলেখা অধিকারী
সুশীল খান্না
সোমনাথ সমাদ্দার
হেমেন মজুমদার

‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ বনাম পারস্পরিকতার পৃথিবী

অনুরাধা রায়

শতাধিক বছর আগে ঔপনিবেশিক আমলে যে টেবিলে বসে বড়োলাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের হুকুম জারি করেছিলেন, সম্প্রতি বাংলার ‘সাংবিধানিক প্রধান’ সেই টেবিলে বসতে পেরে তাঁর আত্মতৃপ্তি ও গর্বের কথা যথাযোগ্যভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন। বর্তমান ভারতশাসকের প্রেরিত প্রতিনিধি তিনি, শাসকের ‘বিভাজন ও শাসন’ নীতির শামিল তো তাঁর হওয়ারই কথা। তিনি যে প্রবল উৎসাহে সেই নীতির রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছেন, সেও আমরা এরাজ্যে তাঁর আগমন ইস্তক দেখতে পাচ্ছি। ঠিক বঙ্গভঙ্গের আগে আগে কার্জনের অপর একটি স্মরণীয় কীর্তি ‘বিশ্ববিদ্যালয় বিল’, যা ছিল শিক্ষাকে ব্যয়সাপেক্ষ করে তার গ্রহীতাদের পরিসরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া ও দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে ফেলার চেষ্টা— সেরকমও একটা বিল পাশ করাতে পারলে আমাদের সাংবিধানিক প্রধান নির্ঘাত খুশি হতেন। সে কাজটি অবশ্য এখনও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সংবিধানের আওতায় থাকার কী বিড়ম্বনা— রাজ্যস্তরের প্রতিদ্বন্দ্বী-শাসক শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

কিন্তু বিভাজনটা যে কেন্দ্রীয় শাসকরা আমাদের জীবনে আনাচেকানাচে গভীরভাবে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের আগে আর কোনো শাসক এত ভালো করে এটা করে উঠতে পারেননি। হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের কথা শুধু বলছি না (যেটা কার্জনেরও উদ্দেশ্য ছিল, বাইরে ‘প্রশাসনিক সুবিধা’র মোড়কে)। সে তো এঁদের বহুদিনের ঘোষিত এজেন্ডা। সেই কবেই এঁদের গুরুজি বলে গিয়েছেন— মুসলমানরা হিন্দুত্ব না গ্রহণ করলে বড়োজোর হিন্দুদের দয়ায় দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থাকতে পারবে। ‘We or Our Nationhood Defined’ বইটিতে (১৯৩৯) ভারতের মুসলিম সমস্যার সমাধানকল্পে হিটলারের জার্মানিতে ইহুদি সমস্যার সমাধান থেকে শিক্ষা নিতে বলেছিলেন তিনি: 'Germany has also shown how well-nigh impossible it is for races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one united whole– a good lesson for us in Hindustan.' বস্তুত অবাঞ্ছিত জার্মান ইহুদিদের সঙ্গে ভারতের অবাঞ্ছিত মুসলমানদের তুলনা এঁদের কথাবার্তায় বারেবারেই এসেছে। পরে স্বাধীন দেশের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চাপে তার উগ্র উন্মত্ত চেহারাটা একটু নরম করে দেখাতে হয়েছে। মুখের সামনে লাগাতে হয়েছে মুখোশ। ওটা কিছু নয়, সাধুরা ঠিকই সন্ধান জানেন! এন-আর-সি, সি-এ-এ ইত্যাদি করতে যে এত দেরি হয়ে গেল, এটাই তো আপশোসের কথা!

কিন্তু শুধু কি মুসলমান? অন্য সব গোষ্ঠী নিরাপদ? যেমন ক্রিশ্চানরা? বস্তুত সামাজিক স্তরে আন্দোলন করার জন্য এঁরা ১৯৬০-এর দশকে যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তৈরি করলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ক্রিশ্চান-শত্রুদের নিধন, জনজাতিগুলির ওপর প্রভাববিস্তার নিয়ে ক্রিশ্চান মিশনারিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলীয় ক্রিশ্চান মিশনারি গ্রাহাম স্টেনস আর তাঁর দুই বালক পুত্রকে বজরং দলের পুড়িয়ে মারার কীর্তিও আমাদের মনে থাকার কথা। আর আজই কাগজে পড়লাম, কলকাতার এক বাঙালি ভদ্রলোকের স্ত্রী ও সাত বছর ধরে এখানকার অধিবাসী এক ব্রিটিশ মহিলাকে রাস্তায় হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দেশে ফিরে না গেলে ধর্ষণ করা হবে। এই ঘটনাতেও আলোচ্য মতাদর্শ থেকে উৎসারিত ইদানীংকার প্রগাঢ় দেশপ্রেমের ছায়া।

তবে আজকাল মনে হচ্ছে, ধর্মীয় বিভাজনের চেয়ে শ্রেণিবিভাজনের ভূমিকা এঁদের জীবনদর্শন ও প্রশাসনিক আঁটঘাটে খুব কম নয়। এন-আর-সি ইত্যাদির জন্য যারা কাগজ দাখিল করতে পারবে না, জানা কথাই তারা বেশিরভাগ গরিব মানুষ। অথবা, জে-এন-ইউ-এর মতো প্রতিষ্ঠানে পড়বে কেন গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা! গরিবগুলো আবার বেশিরভাগ নিচু জাতের লোকও বটে। শিক্ষাকে যতটা সম্ভব দামি করে তুলে বড়েলোকদের জন্যে সংরক্ষিত করতে হবে বই কী! সবচেয়ে বেশি বড়োলোক যারা, বিশেষত বড়ো বড়ো ব্যাবসাদার, তারাই

তো হল দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, শাসকের নিকটতম বন্ধু। সাধারণ মানুষ তাদের 'রিসোর্স' বই তো নয়। তবে অ-হিন্দুদের বহিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিচু-জাত, জনজাতিদের অন্তর্ভুক্ত করে হিন্দুজাতির শক্তিবৃদ্ধিও এঁদের এজেন্ডাতে আছে। অন্তর্ভুক্ত করো, আবার দাবিয়েও রাখো— বেশ জটিল প্রক্রিয়া। আংশিক সাফল্য পেয়েছে বটে সে প্রক্রিয়া, কিন্তু অনেক গোলমাল থেকেই গেছে ভেতরে ভেতরে। বরাবর, নানা দিক থেকেই, এদের মতাদর্শের মধ্যে বৈধতা লালিত হয়েছে। ওই যে বললাম, মুখের সঙ্গে মুখোশটাও এঁদের পক্ষে খুবই জরুরি। এক্ষেত্রেও সেটাই দেখা যায়। যেমন, আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানানো হয় হরদম, আবার আম্বেদকরের ছবি দরজায় আঁকা থাকলে জে-এন-ইউ-এর হস্টেলের ঘরে ঢুকে অসহায় অন্ধ ছাত্রকে পেটানো হয়। সারা দেশ থেকেই প্রায়শ দলিতদের ওপর নির্মম নিপীড়নের খবর আসে। আসলে এঁদের হিন্দু সমাজেও অনেকানেক টুকরো। সারা দেশ আজ ভেঙে চুরমার, অসংখ্য টুকরোতে ভরতি। নগর-নকশালদের টুকরো। বহু টুকরো ডিটেনশন ক্যাম্প। আর কাশ্মীর তো একটা বড়ো টুকরো বটেই।

ইদানীং অণুক্ষণ যন্ত্রণার সঙ্গে আরো যেটা উপলব্ধি করছি তা হল— দৈনন্দিনের চেনা সমাজটাও একেবারে ফুটিফাটা ভাগ হয়ে গিয়ে বীভৎস দগদগে চেহারা নিয়েছে। বাইপাস থেকে আনওয়ারশাহ রোডের কানেক্টরে ঢোকার মুখে ট্র্যাফিক সিগনালে একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলে আমার ড্রাইভার বিরক্তি প্রকাশ করে— 'যত্তসব পাকিস্তানি আর বাংলাদেশিগুলোর জন্যে এত জ্যাম!' আমার স্কুলের প্রিয় বন্ধু, অনেকদিন বাদে আবার যোগাযোগ— যাকে খুব নরমসরম মনের মেয়ে বলেই জানতাম, শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারের বধূ এখন— সে মোবাইল ভরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উগরে দিতে থাকে এবং প্রতিবাদ করলে আমাকে ইতিহাস শেখানোর চেষ্টা করে। একটা সময়ে তাকে ব্লক না করে আমার উপায় থাকে না। আইটি সেক্টরের মার্জিত অমায়িক প্রতিবেশী, সদ্য চাকরি খুইয়েছে অবশ্য, আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে দেশের অর্থনীতির অবস্থা খুবই ভালো, যেটুকু খারাপ মনে হচ্ছে সেটা কড়া হাতে দুর্নীতি আটকানো হয়েছে বলে। হাওয়ায় ভাসে কত পরিপাটি মিথ্যা, জনজীবনে শিকড় গাড়ে চমৎকার সব মিথ। রামজনমভূমির পরিপূরক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের জাতির জীবনে, ইতিহাস/সমাজবিদ্যার ছাত্র তাতে যতই অসহায় বোধ করুক। আর কিছু না হোক, দুর্নীতিগ্রস্ত, অপদার্থ, উপরন্তু একতাহীন বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষের বিকল্প হিসেবেও আজকের শাসকদের সমর্থন করেন অনেকে।

হ্যাঁ, দেশ আজ বহুবিভাজিত— 'টুকরে টুকরে'। এদের কথাটা এদেরই ফিরিয়ে দিয়ে বলতে হয়— এরাই খাঁটি 'টুকরে টুকরে গ্যাং'। মানুষের মনের গহিন অন্ধকারে মিথ্যা, অযুক্তি আর অ-সংবেদনশীলতা দিয়ে লালিত হচ্ছিল যত ঘৃণা আর হিংস্রতা, সব এরা দিনের আলোয় টেনে বের করেছে, তা দিয়ে টুকরো টুকরো করছে দেশটাকে। ফলে আমরা আছি একটা গৃহযুদ্ধের মধ্যে, গোটা দেশই আজ রণক্ষেত্র। অবশ্য সার্জিকাল স্ট্রাইকের স্ট্র্যাটেজিও এখানে সক্রিয়। মাঝে মাঝেই দেশপ্রেমিক বীররা তার প্রয়োগ ঘটান। বহিঃশত্রু হিসেবে আছে পাকিস্তান, আর আভ্যন্তরীণ শত্রু বলতে প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। যেমন গতকাল জে-এন-ইউ-এর ঘটনা। তার আগে জামিয়া মিলিয়া, আলিগড়, আর হ্যাঁ, আমাদের যাদবপুর। এই ধরনটা একেবারে 'আতঙ্কবাদী' সুলভ (আবারও ওদের কথা ওদেরই ফিরিয়ে না দিয়ে উপায় নেই)। যাদবপুরে কিছুদিন আগে আমাদের সাংবিধানিক প্রধানের গাড়ি অনুসরণ করে আতঙ্কবাদীরা দিব্যি ঢুকে পড়েছিল, তাণ্ডব চালিয়েছিল (তিনি বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাত থেকে শাসকপক্ষের মন্ত্রীকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছিলেন সেখানে, সেই সুযোগে)। কাল তো জে-এন-ইউ-এর করিডরে মুখে কালো কাপড় বাঁধা, রড লাঠি হাতে লোকগুলোকে দেখে হাড় হিম হয়ে যেতে যেতে একেবারে আইসিসের 'জেহাদি জন'কে মনে পড়ে গেল। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় যাদবপুরসহ চারদিকে তুমুল প্রতিবাদের মধ্যে ভাসতে ভাসতে মনে হল, এক পুরোনো সহকর্মীর মেয়ে জে-এন-ইউ-তে হস্টেলে থেকে পড়ে, তার খোঁজ করা দরকার। ফোন করতে তিনি আশ্বস্ত করলেন, মেয়ে ঠিকই আছে, ওর হস্টেলে আক্রমণ হয়নি, ওকে ঘরের মধ্যে সাবধানে থাকতে বলেছেন তিনি। তারপর শুরু করলেন— 'সবটাই আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। সাবসিডাইজড রেটে পড়ে, একটু ফি বাড়ালেই দোষ! নিজেরাও পড়াশোনা করে না, যারা রেজিস্ট্রেশন করতে চাইছে তাদেরও করতে দেবে না! ভেবে দেখো, তোমার আমার টাকাতেই এইসব অবাধ্য বেয়াদব ফাঁকিবাজ সুবিধাবাদী ছাত্রছাত্রীদের পোষা হচ্ছে!' হস্টেলে গুন্ডাবাহিনীর নৃশংস আক্রমণ নিয়ে তাঁর বিশেষ হেলদোল নেই। বললেন, 'ওটা ঠিক হয়নি বটে, কিন্তু দোষী তো আসলে ছাত্ররাই।' তারপর তিনি এন-আর-সি এবং সি-এ-এ-র সমর্থনেও অনেক কথা বললেন। আমি বললাম, তাঁর আরেক কন্যা যে কিনা পশ্চিমি দেশে সেটল করেছে, সেখানে তাকে যদি বলা হয় হিন্দু হয়েও সে যখন হিন্দু দেশ থেকে এসেছে তখন নিশ্চয়ই অনুপ্রবেশকারী, তিনি বেজায় ক্ষুব্ধ হলেন; বললেন ও ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যেও যে ভালো লোক থাকে ও ব্যক্তিগতভাবে কিছু মুসলমানের সঙ্গে যে তাঁর সুসম্পর্ক আছে, সে কথা জানাতেও ভুললেন না।

টুকরো টুকরো দেশ আমার। মুখোশের আড়ালে, লোহার

রড আর লাঠির আস্ফালিত জেহাদি জঙ্গিপনায়, দেশপ্রেমের নামে খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়া হচ্ছে দেশটাকে (জে-এন-ইউ কাণ্ডের প্রতীকী তাৎপর্য স্বতই লক্ষণীয়)। তবে হ্যাঁ, প্রতিবাদী গর্জনও শুনছি। এই সমাজেরই নানা অংশ থেকে জমাট বাঁধছে প্রতিবাদ। মুসলিম যারা ভয়ে ভয়ে ছিল, তারাও যেন পেয়েছে অভয়ের শক্তি। আর সর্বোপরি আছে—একজন শিক্ষক হিসেবে খুব গর্ব করে বলছি— আমাদের ছাত্ররা। শাসকের মিথ আর মিথ্যা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তাদের জমাট প্রতিবাদে ধাক্কা খেয়ে। জাতীয়তাবাদগর্বী শাসক, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে যাদের অবদান প্রায় কিছুই নেই, বস্তুত পাকিস্তান না তৈরি হলে যাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখাই মুশকিল হত, তারা আজ বুঝছে সত্যিকারের জাতীয়তার মানে। বুঝে খেপে উঠেছে অবশ্য। আরো আরো অসংলগ্ন, পরস্পরবিরোধী কথা বলছে, আরো আরো নির্মম সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা তো শিক্ষাকে ভয় পায়, চিন্তাকে ভয় পায়, যুক্তিকে ভয় পায়। তাই ছাত্রদের প্রতিবাদেই সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে, ছাত্রদেরই প্রধান টার্গেট করেছে। তবে তাতে বোধহয় ওরা আরোই জনসমর্থন হারাচ্ছে। কার্জন আর বঙ্গভঙ্গের কথা দিয়ে এই লেখা শুরু হয়েছিল। সেদিনের সেই আন্দোলনেও তরুণ ছাত্রদের (অনেকে নিতান্ত বালক বা কিশোর) অগ্রণী ভূমিকা ছিল, আর শাসকও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের দমন করতে। এইটা মানুষের খুব লেগেছিল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কবিতা লিখলেন— 'শুনি ইহুদীদের দল, যখন ছিল হীনবল,/ হেরোদ রাজা বালক বধে গেল রসাতল/হল হত শিশুর রক্তপাতে কংসের ধ্বংস মথুরায়'। কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত— 'ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়,/একটি ছেলে দিবি বলি/উঠবে শত মৃত্যু ঠেলি/দেখব ওরা কত খেয়ে তৃপ্তি ওরা পায়।/জানিস তো মা আগাগোড়া/রক্তবীজের বংশ মোরা/রক্ত ফুটে লক্ষ হব ধ্বংস-সাধনায়/ওরা কত রক্ত চায় গো— দেখব কত রক্ত চায়।' শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ শাসককে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হয়। আজ অবশ্যই আমাদের তরুণ রক্তবীজের দলকে দেখে ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগছে মনে।

কিন্তু ইতিহাস যে বড্ড জটিল তাও তো জানি। চার দশক পরে আবার সেই বঙ্গভঙ্গ তথা দেশভাগই তো হল। বেশিরভাগ হিন্দু-মুসলমানের সাগ্রহ সম্মতিতেই হল। বস্তুত আজকের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দেখতে দেখতে আমার বেশ আপশোস হচ্ছে— আহা, সেদিন যদি সুলেখার মোড়ে, শাহিনবাগে, ইন্ডিয়া গেটে এমন প্রতিবাদী জমায়েত হত, আজকের সমস্যাটা হয়তো তৈরিই হত না। কিন্তু বৃথা আক্ষেপ, ইতিহাসকে তো আর পিছনপানে ফেরানো যাবে না।

তাৎক্ষণিক আবেগের ওপরে উঠে তাই আজকের সংগ্রামটাকে একটু বড়ো করে ভাবতে ইচ্ছে করে। এ কি সীমিত ওভারের টোয়েন্টি-টোয়েন্টি? নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকবে এই খেলা? কী হবে এর পরিণতি? এটুকু জানি, যুদ্ধজয় কিন্তু খুব প্রয়োজন। এ এক মহাসংগ্রাম চলছে—একদিকে আমরা যারা 'নানা ভাষা নানা মত, নানা পরিধান' নিয়ে শান্তিতে পারস্পরিকতার মধ্যে একসঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিলাম, অন্যদিকে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'। এটা ভারতবর্ষ দখলের যুদ্ধ। দেশপ্রেমী বনাম দ্বেষপ্রেমীদের যুদ্ধ। 'আজাদি'র স্লোগান-তোলা মানুষদের সঙ্গে স্বাধীনতাভীত মানুষ যারা শক্তিমান আগ্রাসী নির্মম শাসকের পায়ের তলায় নিজেদের সঁপে দিয়ে আরাম পেতে চাইছে তাদের লড়াই (দ্রষ্টব্য এরিক ফ্রমের বই 'Fear of Freedom'—এই তত্ত্ব দিয়ে তিনি জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের ব্যাখ্যা করেছিলেন)। কিন্তু শুধু তো দেশ নয়, এই লড়াইটাকে দুনিয়া দখলের যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত করেও দেখা দরকার— যা কিনা বিশ্বব্যাপী লোভী দাপুটে ক্ষমতার আস্ফালনের সঙ্গে শুদ্ধ সর্বজনীন মানবতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ আমরা জিততে না পারলে গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন। পরিবেশ বিষিয়ে যাচ্ছে, রশদে টান পড়ছে, অর্থনীতি বেহাল। বৈজ্ঞানিকরা অনেকেই বলছেন আমাদের মানবপ্রজাতি ও পৃথিবীগ্রহের সামনে খুব বেশি দিন আর নেই। যে পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে সুচিন্তিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস, সেই পরিস্থিতি পৃথিবীর নানা কোনায় হয়ে উঠেছে কর্তৃত্ববাদী শাসকদের দারুণ সুযোগ। তারা ঘৃণার, বিচ্ছিন্নতার রাজনীতিতে মজেছে, মানুষকেও মজাচ্ছে— যে রাজনীতি ক্রমেই বেশি করে সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যায় মানুষের সত্তাকে। তাই ব্রেক্সিট করে ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এলেই ব্রিটেনের সমস্যা মেটে না; স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতা তাতে আরো ঘনীভূত হয়। দুনিয়ার অনেক জায়গাই আজ রক্তাক্ত রণাঙ্গন। মোটের ওপর যেন পরিবেশগত কারণে ধ্বংসের আগেই আমরা মানুষরা নিজেরাই মুষলহাতে পরস্পরের ওপর চড়াও হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবু তরুণ প্রজন্মকে দেখে মনে ভরসা আনতে চাইছি— না, এত সহজে মানুষ হার মানবে না। অমারাত্রির দুর্গতোরণ ধূলিতলে ভগ্ন করে মানব-অভ্যুদয় হবে উদয়দিগন্তে।

কিন্তু বড়ো করে লড়াই জেতার কথা যদি ভাবতে হয়, তারজন্য কয়েকটি শর্ত বোধহয় পূরণ করা জরুরি। প্রতিবাদ করলেও এখনও পর্যন্ত কোনো বিকল্প মতাদর্শের সন্ধান কিন্তু আমরা পাইনি, সেটা নিতান্ত দরকার। সেই বিকল্প মতাদর্শে শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্বের সমস্যা নিয়ে ভাবনা প্রয়োজন, তার জন্য বিশ্ব জুড়ে ঐকতান ওঠা প্রয়োজন। কান পেতে তেমন কোনো তান তো কই শুনছি না। আর আজও আমরা নিজেরা

প্রত্যেকে ‘ছোটো আমি’ থেকে ‘বড়ো আমি’ হয়ে ওঠার, নিজেদের পালটানোর কোনো লক্ষ্য নির্ধারিত করিনি নিজেদের জন্যে, বরং আরো বেশি করে আত্মবিধ্বংসী ভোগবাদী সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। তরুণ প্রজন্ম অবশ্যই যে-কোনো শুভবুদ্ধিজাত আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো ভরসা। কিন্তু তাদের ওপরেও তো ক্রিয়াশীল থাকতে পারে স্বার্থসর্বস্ব পার্থিবতায় মগ্ন সমাজের মূল্যবোধ এবং সংকীর্ণ রাজনীতির সুবিধাবাদী চিন্তাহীন বাঁধাগত। যৌবনের মনস্তত্ত্ব, তার সাহস, আত্মত্যাগ, বিদ্রোহপ্রবণতাকে বুঝতে গিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ এরিক এরিকসন বলেছিলেন, যৌবন প্রায়শই কোনো একটা আদর্শে শামিল হওয়ার, আনুগত্য জ্ঞাপনের প্রয়োজন খুব অনুভব করে, যেখান থেকে সে পাবে একটা যৌথ আত্মপরিচয়। তার ফলে কিন্তু 'Youth may exploit (and be exploited by) the most varied devotions.' তাই দেশদুনিয়ার মঙ্গলকামী মানবিক কোনো মতাদর্শে তরুণরা যেমন আলোড়িত হতে পারে, তেমনি জেনোফোবিয়া-তাড়িত কোনো আন্দোলনেও তারা অংশ নিতে পারে। হিটলারের তরুণ আর্যবাহিনী থেকে আজকের ভারতে শাসকদলের ছাত্রসংগঠন পর্যন্ত এমন উদাহরণ অনেক আছে। সুতরাং অনেক ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ আছে সামনে, অনেক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হবে। তার জন্য যেন প্রস্তুত হই আমরা, যেন সাবধান যাকে আমাদের তরুণ প্রজন্ম।

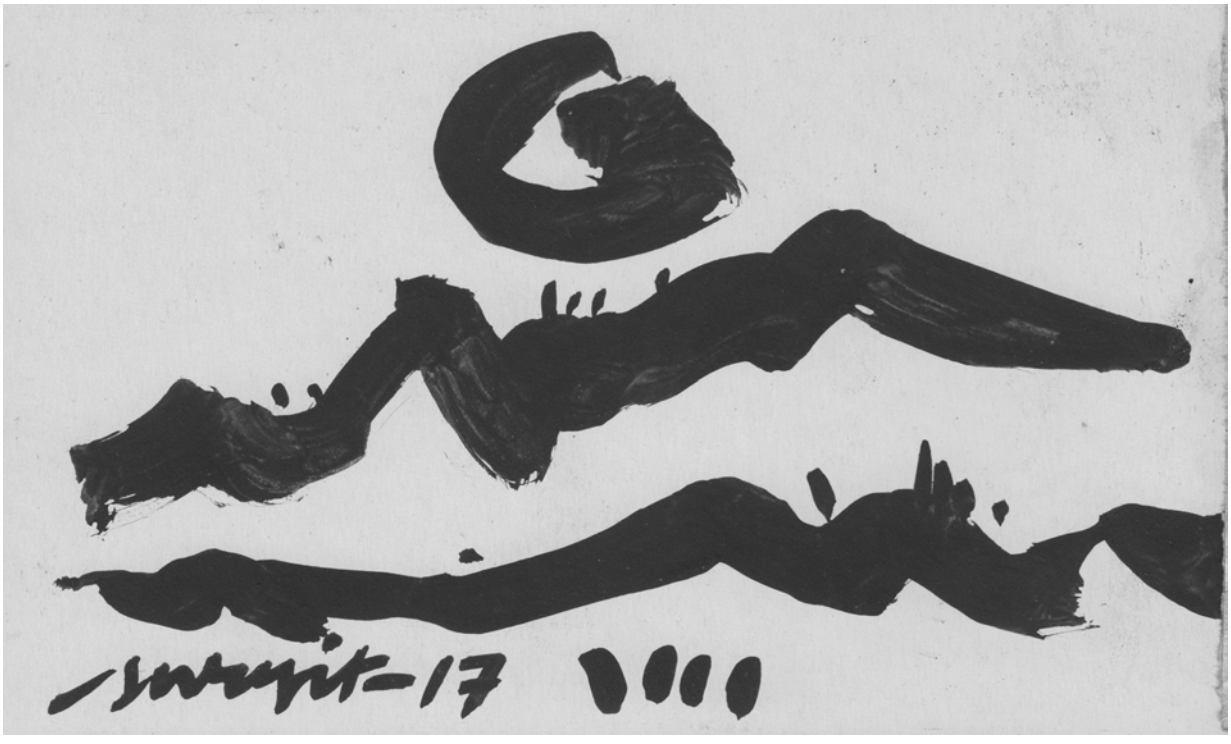

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

বার্লিন প্রাচীরে ভাঙন, ইউরোপে কমিউনিজমের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান

অরুণ সোম

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মাঝখানে এই প্রাচীর দাঁড়িয়ে ছিল। নির্মাণকর্ম শুরু হয়েছিল ১৯৬১ সালের ১২ আগস্ট রাতে, ওয়ালটার উলব্রিখটের পূর্ব জার্মান সরকারের সময়, সমর্থন করেন তৎকালীন সোভিয়েত নেতা নিকিতা খ্রুশশ্যোভ্। চল্লিশ বছর ধরে এই দেয়াল পূর্ব ও পশ্চিমের সীমান্ত স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল।

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে ক্রেমলিনে আরো একজন সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতা চেরনেনকো-র অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা যখন সমবেত হয়েছিলেন সেইসময় নবনিযুক্ত সোভিয়েত পার্টি-কর্ণধার গর্বাচ্যোভ্ তাঁর পূর্ব ইউরোপের মিত্র দেশগুলির পোড়খাওয়া রাষ্ট্রপ্রধানদের ডেকে স্বল্পকালীন আলাপ-আলোচনার ফাঁকে তাঁদের কানে একটি যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গর্বাচ্যোভ্ নিজে সেই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন: 'আমি তাঁদের বলেছিলাম আপনাদের দেশে কী ঘটে না ঘটে আপনাদের নিজেদের এবং আপনাদের পার্টিগুলিকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। তাঁরা আমার কথা শুনে গেলেন বটে...কিন্তু আসল বিষয়টা কতদূর কী বুঝেছিলেন আমার সন্দেহ আছে।'

কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে মস্কোর ওই মিটিংই নাকি ইউরোপে কমিউনিজমের অবসানের সূচনাস্থল এবং তারই জেরে ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের ভাঙন— যা ছিল আশির দশকের সর্বাধিক চমকপ্রদ এক নাটকীয় ঘটনা। এই ঘটনার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে দুই জার্মানি এক হয়ে গেল, আরো এক বছরের মাথায় ভেঙে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে আশির দশকটি শুরুই হয়েছিল বড়ো দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করল। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শক্তি ছিল পঞ্চাশ হাজার। ব্রেজনেভ্ তখন এমন কথাও বলেছিলেন যে তিন-চার সপ্তহের মধ্যে সব মিটে যাবে, কিন্তু সে-যুদ্ধ চলল এক-দশক ধরে। দশ হাজারেরও বেশি সৈন্যের এবং হাজার হাজার আফগান মানুষের প্রাণহানি ঘটল।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পশ্চিমের কূটনৈতিক সম্পর্ক মাত্রাতিরিক্ত বিষিয়ে উঠল। পশ্চিম ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিক বয়কট করল, প্রত্যুত্তরে চার বছর বাদে সোভিয়েত ব্লকও লস এঞ্জেলেসের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান থেকে বিরত থাকল, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় তীব্র গতি সঞ্চারিত হল, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'দুষ্ট সাম্রাজ্য' আখ্যা দিলেন।

কিন্তু গর্বাচ্যোভ্ ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি পালটে গেল। রেগান এবং থ্যাচার— দুজনেরই কেন যেন মনে হল এঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। ১৯৮৬ সালে আইসল্যান্ডের রেকইয়াভিকে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে রেগান ও গর্বাচ্যোভ্ দু-জনেই দূরপাল্লার স্ট্রাটেজিক অস্ত্র সংকোচনের ক্ষেত্রে সমঝোতার কাছাকাছি চলে এলেন।

দশক শেষ হতে না হতে গর্বাচ্যোভের পেরেস্ত্রৈকা-গ্লাস্নস্তের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সুযোগে পূর্বে ইউরোপের ঘটনাবলির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল। একের পর এক সেসব দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটতে লাগল। এর পর ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বলটিক উপকূলবর্তী তিনটি অঙ্গ রাজ্যই এবং পরে উকাইনা, তারপর থেকে একে একে অন্যেরাও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গর্বাচ্যোভের নিজেরই চাকরি চলে গেল।

১৯৯০ সাল নাগাদ নিজের দেশেই গর্বাচ্যোভের এমন হাল হয়েছিল যে সে বছর রেড স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত চিরাচরিত মে দিবস উৎসবের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জনতার একটা বড়ো অংশের রোষের মুখে পড়েন, তারা তাঁকে টিটকারি দেয়, গর্বাচ্যোভ তাঁর ভাষণ শেষ করতে পারেননি।

এরকম ঘটনা যে ঘটবে গর্বাচ্যোভ্ যে তা অনুমান করতে পারেননি এমন নয়। বার্লিন-প্রাচীরের পতনের ঠিক এক মাস

আগে গর্বাচ্যোভের উপস্থিতিতে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ৪০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে পূর্ব জার্মানির কর্তৃপক্ষের উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল যখন পূর্ব বার্লিনের একটি প্রাসাদে সমবেত হয়েছিলেন, সেই সময় প্রাসাদের বাইরে বিপুলসংখ্যক প্রতিবাদী জনতা গর্বাচ্যোভের নাম আওড়াতে আওড়াতে চেঁচাতে থাকে। তা দেখে সেখানে উপস্থিত জনৈক পূর্ব জার্মান নেতা গর্বাচ্যোভের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তা হলে কি এখানেই শেষ?' গর্বাচ্যোভ্ জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে থেকে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, এখানেই শেষ।'

গর্বাচ্যোভের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। অতএব স্বীকার করতে হয় গর্বাচ্যোভ্ যা করেছিলেন সচেতনভাবেই করেছিলেন। গর্বাচ্যোভের সমস্যাটা এখানে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কথায় ও কাজে ব্যবধান দুস্তর। দুই জার্মানির সংযুক্তির সময় যে সমস্ত শর্ত তিনি ইচ্ছে করলেই আরোপ করতে পারতেন বা যে ধরনের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারতেন অথবা নিজের লোকদের সেখান থেকে বের করে আনতে পারতেন তার কিছুই তিনি দাবি করলেন না। এমনকী সংযুক্ত জার্মানির ন্যাটোভুক্ত হওয়ার অধিকারেও তেমন কোনো আপত্তি প্রকাশ করলেন না।

বার্লিনের প্রাচীন ভাঙার মাত্র কয়েক মাস আগেও ১৯৮৯ সালের জুন মাসে তৎকালীন পূর্ব জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান এরিক হোনেকারকে কথা দিয়েছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে প্রতারণা করবে না। কিন্তু কার্যত কিছুদিন বাদে সেটাই ঘটল। নিজের লোকদের কাছে কথা তিনি কোনো কালেই রাখতে পারেননি। হোনেকারকে সাদরে গ্রহণ করে পরে তিনি আর হালে পানি পেলেন না। অবশ্য ততদিনে তিনি ক্ষমতাও হারিয়েছেন। আফগানিস্তানের ব্যাপারেও তাই, তবে এসবের অর্ধেক দায় পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান ইয়েল্‌ৎসিনের ওপরেই বর্তেছিল, আর তাঁর বিশ্বাসভঙ্গের কথা তো সুবিদিত।

একটি বিশ্বাসঘাতকতা

প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে

০১.১১.১৯৯১ : পূর্ব জার্মানি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন সামরিক পাট চুকিয়েছে। সেই সময়, গত বছর (১৯৯০) ১৩ মার্চ সাবেক জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এরিক হোনেকারকে সেখানকার সোভিয়েত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার নাম করে সোভিয়েত সরকার তাঁকে গোপনে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাচার করে নিয়ে আসে। জার্মানিতে হোনেকার তখন ছিলেন বিচারাধীন আসামি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ— পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিমে পলায়নকারী নাগরিকদের উপর তিনি ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তার ফলে যে উনপঞ্চাশ জন ব্যক্তির প্রাণহানি হয় সেজন্য তিনিই দায়ী।

জার্মান সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁকে জার্মানির ন্যায়বিচারের হাতে তুলে দেওয়ার বারবার দাবি জানান সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে। নানারকম টালবাহানা করে সোভিয়েত সরকার তা বেশ কিছুদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

মস্কোর উপকণ্ঠের এক বাড়িতে রাখা হয়েছে হোনেকারকে। তাঁর বয়স এখন আশি। যৌবনের প্রথম দশ বছর তাঁকে কাটাতে হয়েছিল নাতসি জার্মানির জেলে। বিজয়ী সোভিয়েত বাহিনী তাঁকে উদ্ধার করে। এবারও তাঁর উদ্ধারকর্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য।

এখানে থাকাকালেই এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, তাঁর ওপর থেকে বেআইনি গ্রেপ্তারের পরওয়ানা তুলে নিলেই তিনি দেশে ফিরে যাবেন। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি যে কর্তব্য পালন করেছেন তাঁর বিচার করার কোনো অধিকার পশ্চিম জার্মানির সরকারের নেই। তাঁর মতে, লাইপ্‌ট্‌সিকের রাস্তায় যারা 'আমরা এক জাতি' বলে আওয়াজ তুলেছিল তারাই যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিলোপ ঘটায় এমন মনে করা ভুল হবে। আসল প্রেরণা এসেছিল মস্কো থেকে। (প্রসঙ্গত, বাস্তবিকই তো ১৯৮৯ সালের ১৫ থেকে ১৮ মে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচ্যোভের বেইজিং সফরের কথা ভুলে গেলে চলবে কী করে? গর্বাচ্যোভের বেইজিং পরিত্যাগের অব্যবহিত প্রাক্কালে খোদ বেইজিং-এই ঘটে গেল গ্লাস্‌নস্তের বিস্ফোরণ—১৮ মে তিয়েনানমেন স্কোয়ারে দশ লক্ষ বিক্ষোভকারীর সরকারবিরোধী মিছিল!)।

এই ধরনের সমস্ত সাক্ষাৎকার দিয়ে তিনি তাঁর নিজের বহিষ্কারের পথ প্রশস্ত করে দিলেন। জার্মান কর্তৃপক্ষের এখন দৃঢ় ধারণা হল তিনি আদৌ গুরুতর অসুস্থ নন। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁকে যখন ওদের হাতে তুলে দেওয়া হল তখন দেখা গেল তিনি বাস্তবিকই গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বারবার বহিষ্কারের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে এবারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর জার্মান চ্যান্সেলর কোল দরবার করেছেন রাশিয়ার সরকারের কাছে। এতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণের যে অজুহাত হোনেকারের দিক থেকে দেওয়া হচ্ছিল সেটা এখন আর খাটার কথা নয়।

তৃতীয় কোনো দেশেও যাবার পথ হোনেকারের বন্ধ। ইতিপূর্বে চিলেতে তাঁর কন্যার কাছে যাবার পরিকল্পনা তিনি

করেছিলেন। চিলের সরকারি সূত্রে একথাও জানা গিয়েছিল যে তিনি যদি চিলেতে আশ্রয় নিতে চান তা হলে সে-দেশের সরকারের তরফ থেকে তাঁকে বহিষ্কারের কোনো আশঙ্কা নেই, যেহেতু জার্মানি ও চিলের মধ্যে আইন সংক্রান্ত পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার কোনো চুক্তি নেই। কিন্তু এরই মধ্যে, ২১ অক্টোবর চিলেতে জার্মান চ্যান্সেলরের সফরের পর পরিস্থিতি বদলে গেল। চিলে এরপর হোনেকারকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। যেহেতু জার্মান পাসপোর্ট তাঁর নেই, অন্য দেশে migrate করার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

রাশিয়ার আইনমন্ত্রীর কথা: চিকিৎসকরা যহি হোনেকারকে সুস্থ বলে মনে করেন তা হলে রাশিয়ার সরকার তাঁকে জার্মানি বিচারালয়ের হাতে তুলে দিতে পারেন! রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী জার্মানির বিদেশ মন্ত্রীকে বলেছেন যে হোনেকারকে আইনত ধরে রাখার কোনো ভিত্তি রাশিয়ার নেই। এখন সোভিয়েত আইন মন্ত্রণালয় রাজি হলেই হল। এখন পর্যন্ত যেটুকু বাধা তা সোভিয়েত ইউনিয়ন আছে বলে।

অবাঞ্ছিত অতিথি বিদায়

০৪.০৮.১৯৯২: সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে। নতুন রাশিয়ার কাছে এখন হোনেকার এক শিরঃপীড়া। অবশেষে মস্কো বন ও সান্তিয়াগোর গভীর উদ্‌বেগ, সাংবাদিকদের জল্পনা কল্পনা— সমস্ত কিছুর অবসান ঘটিয়ে গত ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় বিমানযোগে জার্মানিতে ন্যায়বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো সম্ভব হল সাবেক পূর্ব জার্মানির প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এরিক হোনেকারকে।

শেষ হল তাঁর দীঘ ষোলো মাসের মস্কো বাসের অধ্যায়। গত বছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত গর্বাচ্যোভের অতিথি হিসেবে তিনি মস্কো উপকণ্ঠের একটি বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্ষমতাচ্যুত হলেন তাঁর আমন্ত্রণকর্তা ও পৃষ্ঠপোষক। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন এবং আইনমন্ত্রী নিকলাই ফিয়োদরভ্‌ ঘোষণা করলেন, যে-কোনো মূল্যে হোক তাঁকে জার্মানিতে ফেরত পাঠাতে হবে।

প্রথম পৃষ্ঠপোষক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে হোনেকার পেলেন আর একজনকে— মস্কোয় চিলের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত। হোনেকার আশ্রয় পেলেন চিলের দূতাবাসে। সাতের দশকে চিলেতে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে চিলের বহু শরণার্থীর সঙ্গে এই রাষ্ট্রদূতও আশ্রয় পেয়েছিলেন পূর্ব জার্মানিতে। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে পড়ে শেষকালে তাঁকেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হল। পদত্যাগ করলেন চিলের রাষ্ট্রদূত।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ বনকে চটানোর সাধ্য সান্তিয়াগো বা মস্কো কারো নেই। দুই দেশই তাঁর বড়ো খাতক। আমন্ত্রণকর্তা নেই, তদুপরি দূতাবাস আগস্ট থেকে স্থানান্তরিত হচ্ছে— তার অর্থ এখন যেখানে তিনি আছেন সেই দালানের আর কূটনৈতিক প্রতিরক্ষা থাকছে না, অতএব...

জার্মানিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে চালান করে দেওয়া হল মোয়াবিট জেলখানায়। নাতসিবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে আট বছর বন্দিজীবনের মধ্যে ওই একই জেলখানায় ১৯৩৫-১৯৩৭ সালে তিনি আটক ছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে। এর জন্য 'প্রাভ্‌দা' গত মাসের ৩০ তারিখের সংখ্যায় গর্বাচ্যোভ্‌ ও ইয়েল্‌ৎসিনকে অভিযুক্ত করে। 'প্রাভ্‌দা'-র করুণ নিবেদন: 'আমাদের ক্ষমা কোরো এরিক হোনেকার।' ১ আগস্ট তারিখেও 'প্রাভ্‌দা'য় অনুরূপ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। তার নিজেরই তখন অস্তিত্ব রক্ষা দায় হয়ে উঠেছে।

হোনেকারের আইনজীবীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হোনেকারের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তা ধোপে টিকবে না, সীমান্তে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নয়— ভার্শাভা চুক্তির তৎকালীন প্রধানদের সিদ্ধান্ত।

জার্মানিতে অচিরেই প্রকাশিত হতে চলেছে তাঁর নিজের লেখা একটি বই—'এরিক হোনেকার: নাটকীয় ঘটনাবলি'। বইটির কয়েকটি অধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু করেছে 'Geranyr Stern' সাপ্তাহিক। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কমিউনিস্ট বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ। গুলি করা এবং হত্যার কোনো আদেশ তিনি কখনো দেননি, এরকম নির্দেশ খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

আসলে অভিযোগের বিচার করতে গেলে তা হবে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আইনে। দ্বিতীয়ত, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সুস্পষ্ট ও স্বীকৃতি সীমারেখা ছিল যা লঙ্ঘন করা ছিল বেআইনি। সর্বোপরি বিচার শুরু হলে দুই জার্মানির ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা অনেকেরই অভিপ্রেত নয়।

তা হলে, আরো একটি পন্থা আছে। হোনেকারের বয়স আশি হতে চলল। বার্ধক্য ও গুরুতর অসুস্থতার অজুহাতে বিচারের হাত থেকে অব্যাহতি দান সম্ভব। জার্মানির বিচারব্যবস্থায় তার একাধিক নজির আছে— ব্যাপক গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত অনেক নাতসি অপরাধীর ওপর থেকে সেই অজুহাতে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। সেটা হলে সমাজের চোখে তিনি অপরাধী থেকে যাচ্ছেন আবার জার্মানির আদালত তাঁর মানবতাবোধের পরিচয়ও দিতে পারবে।

ফরাসি সান্ধ্য দৈনিক Mond-এর প্রশ্ন— ঠিক এই সময়ে

রাশিয়া হোনেকারকে ধরিয়ে দিল কেন? উত্তর— অনুমান করা যেতে পারে যেহেতু চ্যান্সেলার কোল-এর জনপ্রিয়তা দেশের পূর্ব অংশে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, তিনি দেখাতে চান বিধিব্যবস্থা রক্ষা করার মতো ক্ষমতা তাঁর আছে। (প্রসঙ্গত পরবর্তীকালে দুর্নীতির দায়ে তাঁর নিজের রাজ্যপাট তো গেলই এমনকী তিনি দেউলিয়াই হয়ে গেলেন)। অন্য দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়েল্‌ৎসিন কোলকে কথা দিয়েছিলেন। কথা না রেখে তাঁর উপায় ছিল না, বিশেষত এমন-একটা মুহূর্তে যখন তাঁর নিজের দেশেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

অবশেষে বিচারাধীন হোনেকারের জেলখানার বাইরে থেকে মামলা লড়ার অনুমতি মিলল। কিন্তু মুশকিল হল জার্মানিতে নিজস্ব বা ব্যক্তিগত কোনো বাসস্থান হোনেকারের ছিল না। শেষ পর্যন্ত জনৈক ধর্মযাজকের কৃপায় এক বৃদ্ধাশ্রমে তাঁর ঠাঁই হল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বার্ধক্যজনিত রোগভোগে আশ্রয়হীন অবস্থায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল।

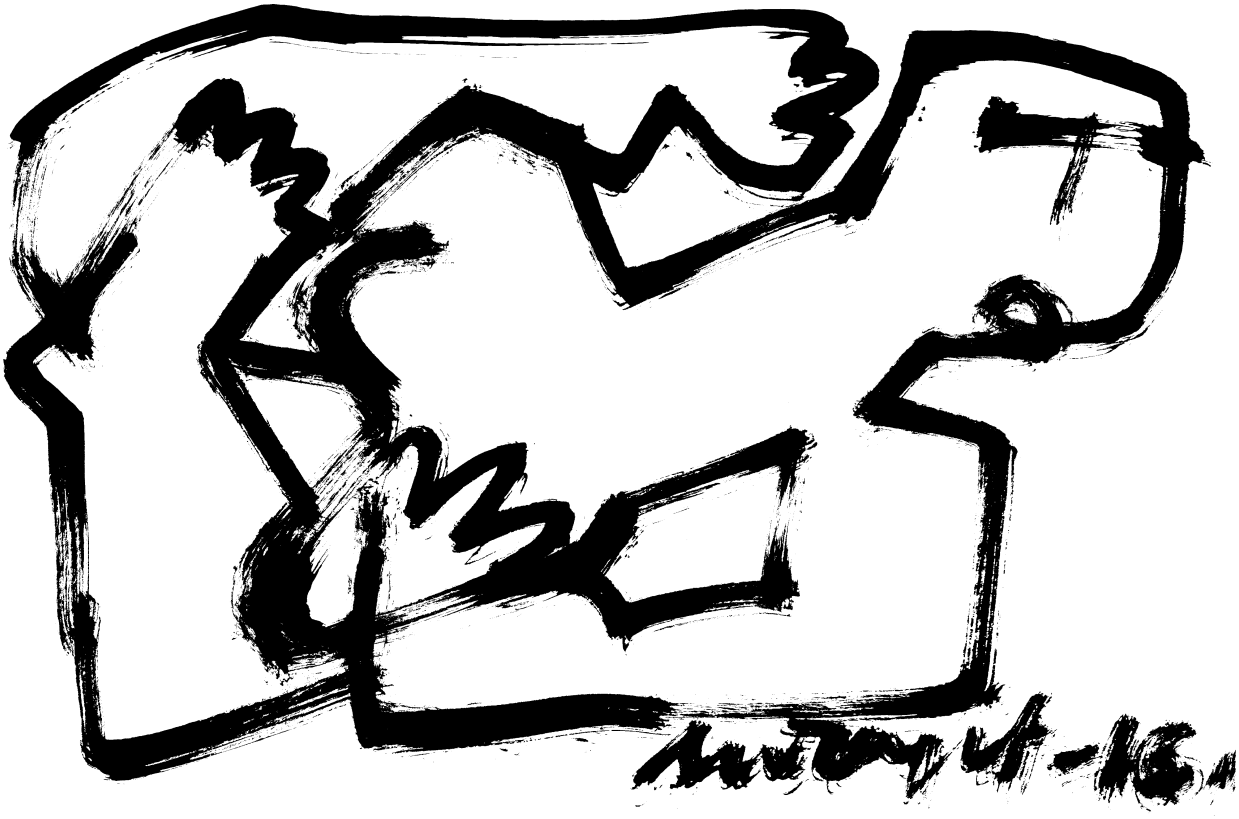

মুখ আর মুখোশ

অজয় রায়

৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ভারতব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সিপিআইএম সহ সারা দেশের বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং এদের অনুগামী বিভিন্ন গণসংগঠনভুক্ত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব মহিলা, কর্মচারী শিক্ষক এবং এই ধর্মঘটকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল কংগ্রেস এবং ওদের অনুগামী, শ্রমিক, কৃষক ও কর্মচারীবৃন্দ। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী যত ভাষণ দিয়েছেন, প্রায় সবকিছুই প্রতিশ্রুতিতেই বিলীন হয়েছে, কোনো কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। এর ফলে দেশব্যাপী বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছিল। বামপন্থীরা স্থানীয়ভাবে এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন এবং প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। সবচেয়ে বেশি শোষিত হচ্ছিল কৃষকরা। মহারাষ্ট্রের কৃষকরা কয়েকবার নজিরবিহীন আন্দোলন সংগঠিত করেছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশেরও এই আন্দোলন কিছু অংশে সফল হয়েছে। ২০১৯ সালে ক্ষমতায় ফিরে এসে মোদী সরকার লাগামবিহীন জনবিরোধী কাজ আরম্ভ করে শুরু থেকেই। ওরা কাশ্মীরকে তিন ভাগ করে পূর্ণ রাজ্যের ক্ষমতা থেকে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজ কাশ্মীরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওদের নেতারা হয় গৃহবন্দী নতুবা জেলবন্দী। এই অবস্থা চলছে গত চার-পাঁচ মাস যাবৎ। আর কতদিন দমন পীড়নের শাসন চলবে ওখানকার মানুষ জানে না। ১৯৪৭ কাশ্মীরের মানুষ পাকিস্তানের বদলে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে আজ ওরা প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

কাশ্মীরের পর এখন সমগ্র দেশে নতুন নাগরিকত্ব আইন সিএএ জারি করে এর সঙ্গে এনআরসি-র জুজু ঝুলিয়ে রেখে বিজেপি সরকার মানুষের মধ্যে অস্থির অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৈরি করেছে। স্বাধীন ভারতে সবসময়ই আইনের চোখে সবধর্মের মানুষই সমান। এর ব্যতিক্রম করা হল নতুন আইন, সিটিজেনশিপ (এমেন্ডমেন্ড) অ্যাক্ট-এ। এই আইনে মুসলমান হলে একরকম ব্যবস্থা আর অন্যধর্মাবলম্বী হলে অন্য ব্যবস্থা। সরকারের উদ্দেশ্য ধর্মের ভিতিতে দেশের মানুষকে বিভক্ত করা। ওরা বিভাজনের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা জারি করতে চায়।

মানুষের পরিচয় শুধু ধর্ম নয়। ওরা বিভিন্ন স্তরে খেটে খাওয়া মানুষ, চাষি ফসলের দাম না পেলে হিন্দু মুসলমান সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে বা সরকার বিভিন্ন সরকারি সংস্থা লাভজনক নয় বলে বন্ধ করে দিচ্ছে। কর্মচারীরা কর্মচ্যুত হচ্ছে। কোনো ধর্মের বাচবিচার না রেখেই।

দেশে কোনো নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না। কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে। বেকারির হার ঊর্ধ্বগামী। মানুষ দিশেহারা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী। বিক্ষোভ ছাত্র যুবকদের মধ্যে। ওরা কর্মসংস্থানের অভাবে চাকরির সুযোগ পাচ্ছে না। বিক্ষোভ সর্বত্র ধুমায়িত হচ্ছে। এই সব বিক্ষোভ চাপা দেওয়ার জন্য সরকার নতুন নতুন দমন পীড়নের পথ খুঁজছে। বিজেপি এবং ওর সহযোগী আরএসএস, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ নানান অছিলায় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে, গুন্ডা পরিবেষ্টিত হয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিভিন্ন বামপন্থীদল ৮ জানুয়ারি ধর্মঘটকে সামনে রেখে সারা দেশে গ্রামেগঞ্জে ব্যাপক প্রচার সংঘটিত করে। এবং বন্ধের ডাকে সর্বস্তরেই মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাতে সফল হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং কৃষকদের আন্দোলনে কংগ্রেস দল বিভিন্ন রাজ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কেরলে ওরা প্রধান বিরোধী দল, তবু ওরা ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের সঙ্গে একযোগে রাজ্যে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস বামপন্থীদের সঙ্গে একত্রে বন্ধের ডাক দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী আইনের বিরোধিতা করে আন্দোলনের অংশীদার হয়ে এগিয়ে এসেছে।

২০১১ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস দল রাজ্যে ক্ষমতাসীন। তৃণমূল কংগ্রেস গণআন্দোলনের মাধ্যমে মানুষকে সংগঠিত

করে ক্ষমতায় আসেনি। ওরা মূলত বামবিরোধী মানুষকে একত্র করে, ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে নির্বাচনে ৩৪ বছরের বাম সরকারের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে। ওদের নিজস্ব কোনো আদর্শ বা সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি ছিল না, যার মাধ্যমে মানুষকে সংগঠিত করে রাখতে পারবে। তাই ওরা একদলীয় শাসনের লক্ষ্যে এগোতে থাকে। গ্রাম শহরে সর্বত্র ওরা বিরোধীদলের কাজকর্ম সন্ত্রাসের মাধ্যমে বন্ধ করে, পঞ্চায়েত, পৌরসভা সর্বত্র একদলীয় শাসন কায়েম করে।

কিন্তু ৮ জানুয়ারি এই বন্ধকে কেন্দ্র করে যে প্রচারাভিযান সংগঠিত হচ্ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় গ্রামের কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে। শ্রমিক এগিয়ে আসে কাজের দাবিতে। ছোটো ব্যবসায়ী এগিয়ে আসে বাজার-মন্দার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছিল, বা চাকরির সুযোগ সংকুচিত হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে মানুষ সারা দেশে একত্রিত হয়ে সাড়া দিয়েছে। এই ধর্মঘট সফল হয়েছে কিনা এর বিচার করা নিরর্থক। কিন্তু ১৩০ কোটি মানুষের দেশে কত মানুষ এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছে এর বিচার অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে লাগাতার ভাবে। আরো বেশি বেশি মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষের ভয় ভাঙছে। মানুষের এই ভয় ভাঙার সাহস শাসক দলকে শঙ্কিত করছে। দিল্লিতে মোদী হাতে গোনা কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে বিরোধীদের মোকাবিলার পথ খুঁজছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসক দল মুখে কেন্দ্রের নতুন আইনের বিরোধিতা করলেও কৃষিক্ষেত্রে এর উলটোদিকে হাঁটছেন। কেরালা বিধানসভায় সরকার এবং বিরোধীরা একত্রে নতুন আইন প্রয়োগের নির্দেশ পালন না করার প্রস্তাব পাশ করেছে। রাজ্যের বিধানসভায় এই প্রস্তাব পাশ করাতে মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করেছেন। ধর্মঘটেও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা বিপরীতমুখী। সরকারি পুলিশ ধর্মঘট বানচাল করার জন্য আইন নিজের হাতে নিয়ে হিংসাত্মক কাজ করেছে। প্ররোচনা দিয়েছে। কিন্তু ধর্মঘটে সামিল হওয়া মানুষকে নিরস্ত করতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। কোনো গণতান্ত্রিক দল বা গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা বলতে পারে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসে বলতে আরম্ভ করেছেন, রাজ্যে ধর্মঘট করতে দেওয়া হবে না। যারা নীতিহীন ওরা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নীতির মুখোশ পালটায়। এখন রাজ্য সরকারের ক্যা (CAA)-এর বিরোধিতা করাটা গৌণ। বিরোধীরা মাথাচাড়া দিচ্ছে, এই শক্তিকে দমন করতে হবে। তাই প্রয়োজনে দেশবাসী বিরোধী ঐক্যের মঞ্চ থেকেও বেরিয়ে আসবেন এটাই আসল চেহারা। মুখ আর মুখোশ এখন আলাদা।

হিন্দুত্বের প্রিজমে ফ্যায়েজ

শান্তনু দে

ফ্যায়েজ জন্মবিপ্লবী। ফ্যায়েজ কমিউনিস্ট। মার-খাওয়া মানুষের জন্য হক কথা বলার অপরাধ তাঁর বরাবর। স্বদেশে বিদেশে যেখানেই থাকুন, ফ্যায়েজ তাঁর লেখায় ও জীবনে কখনো লুঠেরা মানুষের সঙ্গে সমঝোতা করেননি। প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকরাও তাঁকে ছেড়ে কথা বলেননি। ফলে, তাঁর দেশ ও জন্মভূমি আজ তাঁর কাছে দুস্তর প্রবাস। এই তো সেদিন-ও জাঁহাবাজ ইজরায়েলের লোভের আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া লেবাননের অগ্নিব্যূহের মধ্যে আমরা অশান্ত পায়ে হাঁটতে দেখেছি ঐ মানুষটিকে।...ফ্যায়েজ আমাদের দেশকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। পরম আবেগে বারবার উচ্চারণ করেছেন এ-দেশের মানুষের অপ্রতিরোধ্য লড়াই-এর কথা। আমরা তাই ফ্যায়েজ-কে ভালোবাসি। ফ্যায়েজ এই উপমহাদেশের গর্ব।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রথমে পাকিস্তানে। এখন ভারতে।
নিষিদ্ধ 'জাগো হুয়া সাভেরা'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবলম্বনে যে ছবির চিত্রনাট্য, গানের কথা লিখেছিলেন এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফ্যায়েজ আহমদ ফ্যায়েজ। যে ছবি আক্ষরিক অর্থেই ছিল পাকিস্তান, ভারত এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অসাধারণ সব কলাকুশলীদের এক যৌথ প্রয়াস। ফ্যায়েজ ছাড়া আর একজনই ছিলেন পাকিস্তানি। পরিচালক আবদুর রশিদ কাদের। যিনি বলিউডকে দিয়েছেন নৌশাদ, মজরু সুলতানপুরির মতো শিল্পীকে, সুরাইয়ার মতো অভিনেত্রীকে। যাঁর দুলারি ছবিতে মহম্মদ রফির প্রথম হিট গান 'সুহানি রাত ঢল চুকি হ্যায়'। ছিলেন গণনাট্য সংঘের দাপুটে অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। পূর্ব পাকিস্তানের অভিনেতা আতাউর রহমান আর কাজি খালেক। সংগীত পরিচালনায় ভারতের তিমিরবরণ। ক্যামেরায় অস্কারজয়ী ব্রিটিশ চিত্রপরিচালক ওয়াল্টার লাসালি। ছবিটির শ্যুটিং হয় ঢাকার কাছে, মুনশিগঞ্জের এক গ্রামে, মেঘনার কোলে।

মে, ১৯৫৯। ইসলামাবাদে জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসন। করাচির জুবিলি হলে মুক্তির তিনদিন পরেই নিষিদ্ধ হয়ে যায় জাগো হুয়া সাভেরা। অভিযোগ ছবিটি 'কমিউনিস্ট ভাবধারার', অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্রনাট্যকার— সবাই কমিউনিস্ট। লন্ডনে ছবিটির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানের চেষ্টা হলে সামরিক সরকার সেখানে পাক হাইকমিশনারকে ওই অনুষ্ঠান বয়কটের নির্দেশ দেয়। যদিও, সেই নির্দেশ অমান্য করে সস্ত্রীক হাজির ছিলেন পাক হাইকমিশনার।

অক্টোবর, ২০১৬। দিল্লিতে মোদী। মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবে নিষিদ্ধ করা হয় জাগো হুয়া সাভেরা। সংঘর্ষ ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আপত্তির জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় এই ক্লাসিক ছবির প্রদর্শন। ফাউন্ডেশন পুলিশের কাছে জানায়, 'অন্য কোনো ছবিতে আপত্তি নেই, কিন্তু পাকিস্তানের কোনও ছবি যেন দেখানো না হয়।' অথচ, ক'দিন আগেই ছবিটি দেখানো হয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসবে।

কাঁটাতারের দু পারেই কট্টরপন্থীদের হাতে আক্রান্ত ফ্যায়েজ।

ফ্যায়েজের উপর আক্রমণ তাই নতুন নয়। সীমান্তের দু পারে দুই মৌলবাদেরই শিকার তিনি। ফ্যায়েজ যতটা পাকিস্তানি, ততটাই ভারতীয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১। জন্ম শিয়ালকোটে। যে শহরে জন্মেছেন আরেকজন মহান কবি মহম্মদ ইকবাল। পড়েছেন স্কচ মিশন হাইস্কুলে, যে স্কুলে একসময় পড়তেন ইকবাল। অধ্যাপনা অমৃতসরের মেয়ো কলেজে, যে শহরে বসে মান্টো লিখেছেন তাঁর প্রথম গল্প 'তামাশা', জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছিলেন দিল্লিতে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে। বিয়ে করেন শ্রীনগরের মেয়েকে। দেশভাগের পরেও ভারতের প্রতি যাঁর ছিল বুকভরা আবেগ আর যন্ত্রণা। যাঁর দুই কন্যার জন্ম এই ভারতে। সালিমার দিল্লিতে, মুনিজার সিমলায়। যিনি কখনো মেনে নিতে পারেননি দেশভাগকে। মর্সিয়া নামে তাঁর চার লাইনের একটি কবিতায়

জাগা হুয়া সাভেরা ছবিতে তৃপ্তি মিত্র। ছবি: লেখকের সৌজন্যে

এই নৈকট্য আর দূরত্বের ছিল এক অস্বাভাবিক মোচড়। 'দূরে গিয়ে যতটা আছ কাছে/এতটা কাছে আমার কবে ছিলে তুমি/এখন না আসবে না যাবে তুমি/মিলন বিরাহ কতটা হয়ে গেছে একাকার।'

১৯৪৭, পাকিস্তান টাইমসের সম্পাদকীয়তে ফ্যায়েজ যেমন লিখেছিলেন, 'মুসলিমরা পেয়েছেন পাকিস্তানকে, হিন্দু আর শিখরা পেয়েছেন তাঁদের খণ্ডিত বাংলা আর পাঞ্জাবকে। কিন্তু আমি এখনও সেই মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যিনি তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই উৎসাহী। আমি মনে করতে পারছি না এমন আর কোনো দেশকে, যার জনগণ এমন দুর্দশার মধ্যে ছিলেন তাঁদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সময়।'

যে আবেগের তীব্র রক্তক্ষরণ ছিল তাঁর 'সুবহ-এ-আজাদী'তে।

দেশভাগের ঘোষণার ক'দিন বাদে ফ্যায়েজ কবিতাটি লিখেছিলেন নিদারুণ যন্ত্রণায়। সীমান্তের দু পারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা, জীবিকা হারিয়ে সবহারা উদ্‌বাস্তু স্রোত, ধর্ষণ। দেখে ফ্যায়েজের বিস্ময়, এই স্বাধীনতাই কি আমরা চেয়েছিলাম? ভারত, পাকিস্তানকে ভাগ করে যে স্বাধীনতা এসেছে, আমরা কি আদৌ তেমন কখনো চেয়েছিলাম? আমরা কি সত্যিই মুক্ত? ঋত্বিকের 'কোমল গান্ধার', মান্টোর 'টোবা টেক সিং'-এর মতোই ফ্যায়েজের সুবহ-এ-আজাদি'। কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের অনুবাদে 'আজাদির সকাল'।

এই গোমড়ামুখো ভোর
রাতের কালো দাঁতগুলিকে ঢাকতে পারেনি।
বড় দীর্ঘদিন আমরা যার অপেক্ষায়
এ-তো সেই সকাল নয়।
আমাদের কমরেডরা
যারা বিশ্বাস করেছিল শূন্যের এই বিপুল নীলিমায়

কোথাও না কোথাও তাদের ঘুমোনোর জায়গা আছে,
আছে অন্ধকারে ধীরে ধীরে ধুয়ে মুছে দেয়ার মত জোয়ার,
দুঃখের অর্ণবপোতটিকে কাছিতে বেঁধে ফেলার বন্দর—
যে ঝলমলে ভোরের খোঁজে
এইসব ভেবে তারা ঘর ছেড়েছিল—
এ-তো সেই সকাল নয়।

সত্তর বছর বাদে, ২০১৬-তে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে আবার উঠেছে সেই স্লোগান। এবারে এক অন্য সময়, অন্য প্রেক্ষিত। তিহার থেকে মুক্ত কানহাইয়া, উমর খালিদ, অনির্বাণ।

ক্যাম্পাসে স্লোগান: ভুখমারিসে আজাদি! ভেদভাবসে আজাদি! পক্ষশবাদ সে আজাদি! মনুবাদ সে আজাদি! সংঘবাদ সে আজাদি! তুম কুচ ভি কারলো, আজাদি!

আটের দশকে নারীবাদী কবি কমলা ভাসিন লিখেছিলেন, 'আপনি মর্জি সে খুলকার জিনা, হ্যায় আজাদি/জো মন মে হ্যায় খুল কার কেহানা, হ্যায় আজাদি/আপনি শরীর পর হক আপনা, হ্যায় আজাদি।'

ভাসিনের থেকেই এই স্লোগান নিয়েছেন কানহাইয়ারা।

আর ভাসিন এই স্লোগান নিয়েছিলেন আটের দশকে, পাকিস্তানের সামরিক শাসক জিয়ার সময় মহিলাদের একটি মেলা ঘুরে দেখার সময়, যাঁরা প্রতিবাদ দেখাচ্ছিলেন জেনারেল জিয়ার রক্ষণশীল নির্দেশের বিরুদ্ধে।

১৯৮৫, লাহোর স্টেডিয়ামে তৈরি মঞ্চে ধীরে ধীরে উঠে এলেন প্রখ্যাত গজল গায়িকা ইকবাল বানো, যাঁর শৈশব কেটেছে হরিয়ানার রোহতকে। পরনে কালো শাড়ি!

সেদিন মহিলাদের 'হিন্দুয়ানি পোশাক' শাড়ি পরা নিষিদ্ধ করেছিলেন জিয়া। নিষিদ্ধ করেছিলেন ফ্যায়েজের গান ও কবিতার চর্চা। সামরিক ফরমানকে উড়িয়ে বছর পঞ্চাশের শিল্পী ইকবাল বানো মঞ্চে উঠলেন সেই শাড়ি পড়ে। এবং কালো শাড়ি পড়ে। ৫০,০০০ দর্শক শ্রোতার সামনে বানো গাইলেন 'হম দেখেঙ্গে'। এই গান আসলে সব স্বৈরাচারীর নিশ্চিত পতনের এক সদর্প ঘোষণা। দুনিয়ার সব দেশের শোষিত মানুষের জন্য এক আশা-জাগানিয়া গান। এক প্রত্যয়: আমাদের চোখের সামনেই স্বৈরাচারের পতন ঘটবে। বানো যখন প্রায় স্লোগানের ঢঙে গাইছেন, *'সব তাজ উছালে জায়েঙ্গে/সব তখত গিয়ারে জায়েঙ্গে',* তখন স্টেডিয়াম কাঁপিয়ে ওঠে মুহুর্মুহু স্লোগান: 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

হম দেখেঙ্গে, লাজিম হ্যায় কে হম ভি দেখেঙ্গে।

আজকের ক্যাম্পাসে-ক্যাম্পাসে অত্যন্ত জনপ্রিয় উর্দু 'নাজম' বা গীতিকবিতা। নয়া নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময় আইআইটি কানপুর ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ মিছিলে ফ্যায়েজের সেই গীতিকবিতাই গাইছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। আর তা নিয়েই 'হিন্দুত্বের ভাবাবেগে আঘাত লাগার' নালিশ ঠুকেছেন আইআইটি কানপুরের এক শিক্ষক।

প্রধান আপত্তি ফ্যায়েজের কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে।

'জব আর্জ-এ-খুদা কে কাবে সে/সব বুত উঠওয়ায়ে জায়েঙ্গে/হাম আহল-এ-সাপা মারদুদে-এ-হারাম/মসনদ পে বেঠায়ে জায়েঙ্গে/সব তাজ উছালে জায়েঙ্গে/সব তখত গিয়ারে জায়েঙ্গে/বস নাম রহেগা আল্লা কা।'

যখন ঈশ্বরের আবাস থেকে/সমস্ত মিথ্যাচারের বিগ্রহ হটানো হবে/যখন মসনদে বসানো হবে এই আমাদেরকেই/ এতদিন পবিত্র স্থান থেকে যারা ছিলাম নির্বাসিত/সব মুকুট ছিটকে পড়বে মাটিতে/সমস্ত সিংহাসন ভেঙে হবে চুরমার।/ শুধু টিকে থাকবে আল্লাহর নাম।

১৯৭৯, নিউ ইয়র্কে বসে নির্বাসিত কবি লিখেছিলেন 'হম দেখেঙ্গে'— পরবর্তী চার দশকে যা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। পাকিস্তানে তখন স্বৈরশাসক জিয়া-উল-হকের জমানা। জিয়ার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেই ফ্যায়েজ লিখেছিলেন 'হম দেখেঙ্গে'। লেনিন শান্তি পুরস্কার জয়ী, দু-দুবার নোবেলের জন্য মনোনীত এই কবি দেখতেন বিপ্লবের স্বপ্ন। জেলও খেটেছেন। স্বৈরাচারীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে শাসকের সিংহাসন-পতনের স্পষ্ট ইঙ্গিত তাই এই কবিতায়।

যে কবি প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের জনক, তাঁর কবিতার ময়না তদন্ত করছে কানপুর আইআইটি। যা দেখে হতবাক, বিস্মিত এবং একইসঙ্গে ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের প্রগতি ভাবনার মানুষও।

উর্দু কবিতা প্রায়শই নিজের কথা সরাসরি বলে না। বলে পরোক্ষে। উর্দু কবিতায় অনুসরণ করা হয় কবিরকে, অনুসরণ করা হয় মহান সেই সব সুফি সন্তদের, যাঁরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং আক্রমণ করে গিয়েছেন ধর্মীয় চরমপন্থা ও গোঁড়ামিকে। সামগ্রিকভাবে উর্দু কবিতা হল সাধারণ মানুষের দুর্বলতা, তাঁদের প্রতি অবিচার, উৎপীড়ন এবং অমানবিক সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ।

উর্দু আশারে (দুই চরণে) থাকে অগভীর ভাসা-ভাসা অর্থ। যার আসল অর্থ থেকে যায় গভীরে। প্রকৃত অর্থকে বলা হয় আভাসে-ইঙ্গিতে, উপমা-রূপকের আশ্রয়ে। কবির মূল অভিব্যক্তিকে বুঝতে, আসল স্বাদ পেতে প্রবেশ করতে হয় কবিতার অন্দরে। আর এই আঙ্গিক উর্দু কবিরা তখনই খুব বেশি ব্যবহার করেছেন, যখন সরাসরি মুখ খোলা যাচ্ছে না, যখন দেশে সামরিক শাসন। যেমন কবির লিখেছেন: কাঁকর পাথর জোড়কে মসজিদ লিয়ে বনায়ে/তা চাড় মুল্লা বাং দে, কেয়া

বেহরা হুয়া খুদায়েঁ?' ইট ও পাথরে তৈরি মসজিদ/তার উপর থেকে মোল্লা চেঁচাচ্ছে (আজান)। ঈশ্বর কি বধির হয়ে গেছেন?

ফ্যায়েজও তাঁর কবিতায় সবসময়ই এই ধর্মীয় মেটাফর বা রূপক ব্যবহার করতেন। মুসলিম মৌলবাদের অসহিষ্ণু ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর 'প্রতিবাদী কবিতায়' ব্যবহার করেছেন ইসলামিক প্রতীককে। যেমন 'হম দেখেঙ্গে' কবিতায় ব্যবহার করেছেন। উচ্চাঙ্গের কবিতার মর্ম বুঝতে চলে না এহেন স্থূল সমীকরণ। একমাত্র অসত্য-বর্বররাই এই বিদ্রূপকে বুঝেও না বোঝার ভান করতে পারেন। এই কবিতায় কবি রূপক হিসেবে কাবা থেকে মূর্তি অপসারণের যে কথা বলেছেন, তা আক্ষরিক অর্থে মূর্তিপূজার বিরোধিতা নয়। জিয়ার উৎখাত হওয়ার অনিবার্যতাকে বোঝাতেই কাবা থেকে মূর্তি সরানোর রূপকটি ব্যবহার করেছেন।

একইসঙ্গে সুফিদের ঈশ্বর-তত্ত্বের মাধ্যমে কবি প্রকারান্তরে মানুষকেই সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রথমে বলেছেন, শুধু স্রষ্টার বা আল্লাহর নাম টিকে থাকবে। তারপর 'আন-আল-হক' তত্ত্বের মধ্য দিয়ে 'স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে' আমি-তুমিতে বিলীন করে দিয়ে মানবতার কথা বলেছেন। দশম শতাব্দীর ইরানি সুফি সাধক মনসুর হাল্লাজ নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে বলেছিলেন 'আন-আল-হক' বা 'আমিই পরম সত্য'। সুফিবাদ, মরমিবাদে মূল সুর সৃষ্টি আর স্রষ্টার মধ্যে মিলন। বৈষ্ণব মতে তা-ই জীবাত্মা আর পরমাত্মায় মিলন। ফ্যায়েজের গান নিয়ে বিতর্কের পর গীতিকার ও কবি জাভেদ আখতার এর ব্যাখ্যা দিয়ে যেমন বলেছেন, 'হম দেখেঙ্গে'র এক জায়গায় আছে 'গুঞ্জেগা আন-আল-হক কা নাড়া'। *এই 'আন-আল-হক'* মানে 'অহম ব্রহ্মা', আমিই ব্রহ্ম, যা হিন্দু দর্শনের কথা।

যেমন কবিতার শেষে বলেছেন ফ্যায়েজ:

'উঠেগা আন-আল-হক কা নাড়া/জো ম্যায় ভি হুঁ আওর তুম ভি হুঁ/আওর রাজ-করেগি খালকে খুদা/জো ম্যায় ভি হুঁ আওর তুম ভি হুঁ।'

আওয়াজ উঠবে 'আমিই তো পরম সত্য'/যা আমিও বটে, তুমিও বটে।/আর রাজত্ব করবে যারা ঈশ্বরের সৃষ্টি/যা আমিও বটে, তুমিও বটে।

সারা জীবনে ফ্যায়েজ যা লিখেছেন, সবই মৌলবাদের বিরুদ্ধে, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যার জন্য পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের চিরকালের নিশানা ছিলেন তিনি। ভারতে যারা স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে, যারা ভিন্নমতকে সহ্য করতে পারেন না, তাঁরাই একমাত্র ফ্যায়েজকে সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙাতে চাইছেন।

পাকিস্তানের সামরিক শাসন, মৌলবাদীদের হাতে বারেবারে আক্রান্ত তিনি। লিখেছেন তাই 'আমার কালি ও কলম/ওরা কেড়ে নিয়েছে।/ক্ষতি কি?/আমার আঙুল আমি ডুবিয়ে নিয়েছি/আমারই বুকের খুনে।/আমার মুখে ওরা কুলুপ এঁটেছে/কি আসে-যায়/আমার দু'হাতের শিকলই তো/এখন ঝনঝনিয়ে কথা বলছে।'

১৯৩২, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন ফ্যায়েজ। সেসময় দেখা এম এন রায়, মুজফফর আহমেদের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠতা সাজাদ জাহিরের (পরে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক) সঙ্গে। যোগাযোগ গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে। কয়েকবছর পরে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ফ্যায়েজের নিজের কথায়,

১৯৩৫, আমি অমৃতসর কলেজে পড়ানো শুরু করি। কলেজের তরুণ শিক্ষকদের মধ্যে এসব বিষয়ে নিয়ে তর্ক হত। একদিন আমার এক বন্ধু সাহেবজাদা মাহমুদুজাফর আমাকে একটা পাতলা বই দিয়ে বলল, 'নাও, এটা পড়ো, আগামী সপ্তাহে এটা নিয়ে তোমার সাথে তর্ক হবে। তবে বেআইনি বই, একটু সাবধানে রেখো।' বইটা ছিল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। আমি এক বসাতেই বইটি শেষ করলাম। তারপর আরো তিন-চারবার পড়লাম। মানুষ আর প্রকৃতি, ভবিষ্যৎ আর সমাজ, সমাজ আর শ্রেণি, শ্রেণি আর উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টন, উৎপাদন ব্যবস্থা আর উৎপাদন সম্পর্ক আর সমাজ সম্পর্ক, মানব পৃথিবীর মাঝে স্তরে স্তরে সম্পর্ক, বিশ্বাস, চিন্তা আর কাজ— মনে হল এইসব রহস্য সমাধানের চাবি যেন কেউ হাতে ধরিয়ে দিল। এমনি করে সোশ্যালিজম আর মার্কসবাদ নিয়ে আমার আগ্রহের শুরু।

আগে নয়, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ার সময়ই, কিংবা খানিক পরে তিনি লেখেন: 'মুঝসে প্যাহলি সি মুহাব্বাত মেরি ম্যাহবুব না মাংগ।' আগের মতো ভালোবাসা আমার কাছে আর চেয়ো না প্রিয়। তখন যে তাঁর রোমান্স ভাগ হয়ে গিয়েছে বিপ্লবের সঙ্গে।

'এভাবেই উর্দু কবিতার সুরেলা, মদির মর্জিকে একেবারে পালটে দেন ফ্যায়েজ। কিন্তু কোনো সমীকরণে বাঁধা পড়েননি তিনি। রাজনীতি ও মহৎ শিল্প চেতনার শুভ বিবাহের নাম তাই ফ্যায়েজের কবিতা।' বলেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। যেমন দেখেছেন উর্দু ভাষাবিদ ও বিশিষ্ট পণ্ডিত রণেশ দাশগুপ্ত, 'ফ্যায়েজের কবিতার বিকাশে ঐক্যের স্বতস্ফূর্ততা রয়েছে বলেই এলিয়টের প্রথমদিককার কবিতার মতো ব্যতিক্রমের দামামা ধ্বনি নেই, কিন্তু সাবলীলতায় তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে দৃঢ় অতীতে, কোনও চিন্তাচক্রে যাবার সামান্যতম প্রবণতা থেকে। তাঁর দৃষ্টি সামনে, সে দৃষ্টি উদ্ধত না হয়ে পারে না। সে দৃষ্টি অনেক সময় বড় বেশি কোমল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? সে তো আত্মসমর্পণ করেনি মায়া মোহের

কাছে। ফ্যায়েজের কবিতা সংগ্রামী তৎকালীন বিশ্ব কবিতার সাথে যুক্ত করে দিয়েছে যাকে সমৃদ্ধ করেছেন মায়াকোভস্কি, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, কুয়ো মোজো, পাবলো নেরুদা ও নাজিম হিকমত।'

ফ্যায়েজের নিজের কথায়, 'সাধারণত বিপ্লবী কবিরা বিপ্লব নিয়ে হাঁকডাক আর ফাঁকা আওয়াজ তোলেন, বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করেন। কিন্তু বিপ্লবের গান কীভাবে গাইতে হয়, তা তাঁদের জানা নেই। তাঁদের মগজে বিপ্লবের আগমনের যে ছবিটি আছে, তার তুলনা কেবল সাইক্লোন, তুফান বা ধ্বংসের দৌড়োদৌড়ি। তাতে নেই কোনো সুর, নেই হাজার রং-বেরঙের ফুলের বাহার। তাঁরা শুধু বিপ্লবের মারকুটে চেহারাই দেখেন, তার সৌন্দর্যকে দেখেন না বা চেনেন না। বিপ্লব-সম্পর্কে এটা কিন্তু আদৌ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নয়।'

পরে ফ্যায়েজ যুক্ত হন ট্রেড ইউনিয়নের কাজে। শ্রমিকদের কাছে এতটাই আপন ছিলেন, একবার বলেছিলেন,

আমাকে চিঠি লিখতে হলে ঠিকানার প্রয়োজন নেই। চিঠির উপরে শুধু লিখে দিয়ো—ফ্যায়েজ, পাকিস্তান। আমি লম্বা সময় পোস্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে কাজ করেছি। ওরা আমার মানুষ। ওরা জানে কোন সময় আমায় কোথায় পাওয়া যাবে।

একাধিকবার জেলে যেতে হয়েছে ফ্যায়েজকে। বাধ্য হয়েছেন নির্বাসনে যেতে। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৫১-তে গ্রেপ্তারের সময় লন্ডন টাইমস তাঁকে চিহ্নিত করে 'সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রভাবশালী বামপন্থী' হিসেবে। চার-বছর বন্দী থেকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে নির্বাসনে যান ইংল্যান্ডে। ১৯৫৮, ফিরে আসার পরে আবার যেতে হয় আয়ুব খানের কারাগারে। এবারে ছ মাসের জন্য। দু বছর বাদে মস্কো হয়ে লন্ডনে নির্বাসনে। ছিলেন ১৯৬৪ পর্যন্ত। পরে ১৯৭৯, জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসনে আবার নির্বাসনে। এবারে আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধের কেন্দ্র লেবাননে। সম্পাদক হলেন আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের 'লোটাস' পত্রিকার। সরাসরি যুক্ত হলেন পিএলও-র সঙ্গে। নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ইয়াসের আরাফতের সঙ্গে। সেসময় ফ্যায়েজের সঙ্গে দেখা এডওয়ার্ড সাঈদের।

বেইরুট ফ্যায়েজের কাছে ছিল 'হিম্মতের আরশি'।

'চিরকালের মৃত্যুহীন এই শহর'কে দেখে তিনি লিখেছেন, 'বেইরুট—/গোটা দুনিয়ার হিম্মতের আরশি।/বেইরুট—/পৃথিবীতে বেহেশতের গুলবাগিচা।/রাজপথে গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়েছে/ছেলেমেয়েদের খলখল হাসি।/চুরমার সব কিছুর ফাঁক-ফোকরে/উঁকি মারছে রাতের অন্ধকার।/বহতা রক্তের আলোয় আরও লাল হয়ে উঠেছে/বেইরুটের মুখ,/বেহেশতের আলোর চাইতেও লাল,/সেই আলোয় জ্বলছে সব অলিগলি/ভিজে যাচ্ছে লেবাননের মাটি।'

এডওয়ার্ড সাঈদের কথায়, 'ফ্যায়েজকে বুঝতে হলে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। আর তা হলো গার্সিয়া মার্কেজের মতো ফ্যায়েজকেও সাহিত্যের অভিজাত হতে আমজনতা— দুই পক্ষই পড়েছে এবং শুনেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন হল, বিভিন্ন সুরের মিশ্রণে এমন এক অলঙ্কার ও লয় সৃষ্টি করা, যেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন ধ্রুপদী ফর্ম, আবার পাঠকের কাছে সেগুলির রূপ বদলে দিয়েছেন পুরনো ফর্ম থেকে পাঠককে বিচ্ছিন্ন না করেই। যে কোনও ভাষাতেই এমন অর্জন অনন্য— এতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ আপনি এখানে একইসঙ্গে পুরনো এবং নতুনকে শুনতে পাবেন।

ফ্যায়েজের স্পষ্টতা ও শুদ্ধতা বিস্ময়কর। কল্পনা করুন— এমন একজন কবি যাঁর কবিতায় এক হয়ে গিয়েছে ইয়েটসের সংবেদনশীলতা আর নেরুদার শক্তি। আমার মতে, ফ্যায়েজ এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।'

আজীবন কমিউনিস্ট ফ্যায়েজ ছিলেন পাকিস্তানের সেই হাতে-গোনা বুদ্ধিজীবীদের একজন, যিনি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। বস্তুত, বহু আগে থেকেই তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে। পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান জুড়ে জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাতে ফ্যায়েজের বক্তব্য যেন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার আগাম বার্তা,

'এই দুই অংশকে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) এক থাকার ব্যাপারে ধর্মকে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু এক দেশ হওয়ার জন্য যদি এটাই একমাত্র কারণ হয়, তাহলে এই যুক্তি তো দেওয়া যায়, অন্যান্য মুসলিম দেশও কেন পাকিস্তানে যোগ দিচ্ছে না? আর মুসলিম হয়েও অন্যান্য দেশ যদি আলাদা থাকতে পারে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান কেন আলাদা হয়ে যাবে না?'

একাত্তরে পাক সেনাদের গণহত্যার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, 'হাজার করো মেরে তন মে'। আমার শরীর থেকে দূরে থাকো। যে কবিতা বাংলাদেশ-১ নামে পরিচিত। 'সাজাব তবে কীভাবে সাজাব গণহত্যার শোভাযাত্রা/আমার রক্তের চিৎকারে আকর্ষণ করব কাকে?' বাংলাদেশ-২ কবিতায় যেমন লিখেছেন, 'প্রতিটি গাছ রক্তের মিনারের মতো/প্রতিটি ফুলও রক্তমাখা/প্রতিটি চাউনি যেন রক্তের বর্শাফলক।'

এবং ফ্যায়েজের উপর আক্রমণ নতুন নয়।

এই সেদিন ফ্যায়েজ-কন্যা মুনিজাকে আমন্ত্রণ জানিয়েও ফিরিয়ে দিয়েছে দিল্লি। অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশাধিকার দেওয়া দূরের কথা। নির্দিষ্ট হোটেলে পর্যন্ত থাকতে দেয়নি। মে, ২০১৮। নয়াদিল্লিতে ১৫তম এশিয়া মিডিয়া সামিটে আমন্ত্রণ জানানো

হয় পাকিস্তানের মিডিয়া ও টিভি ব্যক্তিত্ব মুনিজাকে। উদ্যোক্তা ছিল এশিয়া-প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভলপমেন্ট (এআইবিডি)। সঙ্গে যুক্ত ছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনেশন (আইআইএমসি) এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক। অনুষ্ঠানের দিন কেন্দ্রের তরফে আয়োজকদের বলা হয়, মুনিজাকে বক্তৃতা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এরপর তাঁকে সম্মেলনে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগও দেওয়া হয়নি। এমনকী, নির্দিষ্ট হোটেলে থাকার অনুমতি পাননি তিনি। হোটেলে পৌঁছলে মুনিজাকে বলা হয়, তাঁর নামে কোনো ঘর বরাদ্দ নেই। বিকল্প হোটেলের ব্যবস্থা করে পরের দিন সকালে পাকিস্তানে ফিরে যান তিনি।

অন্য একটি গল্প শুনিয়েছেন গীতিকার ও কবি গুলজার।

সেবার বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান ফেরার পথে বিমান কলকাতায় নামলে কলকাতা ঘুরে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ফ্যায়েজ। এদিকে তাঁর ভিসা নেই। দৃশ্যতই বিব্রত বিমানবন্দরের অফিসার, চান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশ। বসু ওই অফিসারকে বলেন, আপনি পাঁচ-মিনিটের জন্য ওঁর যত্ন নিন, দেখবেন কোনোরকম অসুবিধা যেন না হয়। এবং, পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দরে বসু এসে বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অতিথি।

সেদিন জ্যোতি বসু বলেছিলেন:

'দক্ষিণ এশিয়ার কোথাও যেতে ফ্যায়েজের পাসপোর্ট লাগে না। তাঁর মুখই তাঁর পাসপোর্ট।'

মুনিজা অবশ্য মোদী সরকারের এই আচরণের প্রতিক্রিয়ায় ফ্যায়েজের কবিতার একটা পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন মাত্র। বলেছেন, 'লম্বি হ্যায় গম কি শাম, মগর শাম হি তো হ্যায়!' দীর্ঘ এ দুঃখের রাত, তবু সে তো শুধুই রাত!

প্রভাতের অপেক্ষা।

ঋণ

ফ্যায়েজ আহমদ ফ্যায়েজ, কবিতা: জাভেদ হুসেন
ফ্যায়েজ আহমদ ফ্যায়েজ: সম্পাদনা ও অনুবাদ জাফর আলম
ফ্যায়েজ আহমদ ফ্যায়েজের কবিতা: অমিতাভ দাশগুপ্ত
পোয়েমস বাই ফ্যায়েজ: ভি জি কিয়েরনান
ও সিটি অব লাইটস, ফ্যায়েজ আহমদ ফ্যায়েজ: অক্সফোর্ড প্রেস
প্রথম আলো, হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

হম দেখেঙ্গে

অর্ধেন্দু সেন

জগৎ বিখ্যাত পাকিস্তানি কবি ফ্যায়েজ আহমেদ ফ্যায়েজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া-উল-হকের দমন নীতির প্রতিবাদ করে এই কবিতা লিখেছিলেন—

হম দেখেঙ্গে হম দেখেঙ্গে
লাজিম হ্যায় কে হম ভী দেখেঙ্গে।
উও দিন কে জিস কা ওয়াদা হ্যায়
যো লওহ-এ-অজল মে লিখা হ্যায়। হম দেখেঙ্গে।

সে দিন আমরা দেখব। নিশ্চয়ই দেখব।
সেদিন আসবে। সে আশ্বাস আমরা পেয়েছি।
নিয়তির লিখন খণ্ডায় কে?

যব জুলম-ও-সিতম কে কোহ-এ-গরা
রুই কি তরহা উড় জায়েঙ্গে।

পর্বত-প্রমাণ জুলুম-অত্যাচার
যেদিন হালকা তুলোর মতো উড়ে যাবে।

হম মেহকুমো কে পাও তলে
ইয়ে ধরতি ধড় ধড় ধড়কেগি
অওর এহল-এ-হকম কে সর উপর
যব বিজলি কড় কড় কড়কেগি

শাসিত-পীড়িতের মিলিত পদক্ষেপে সেদিন
ধরণি উঠবে কেঁপে।
শাসকের মাথায় কড় কড় করে পড়বে বাজ।

যব অরজ-এ-খুদা কে কাবে সে
সব বুত উঠওয়ায়ে জায়েঙ্গে।
হম অহল-এ-সফা মরদুদ-এ-হরম
মসনদ পে বিঠায়ে জায়েঙ্গে।
সব তাজ উছালে জায়েঙ্গে সব তখত গিয়ারে জায়েঙ্গে।
হম দেখেঙ্গে।

খোদার ঘর দখল করে ওরা বসিয়েছে নিজেদের মূর্তি
আমরা নির্দোষ নিরপরাধ। সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ।
সব মূর্তি সেদিন উপড়ে ফেলা হবে।
আমরাই গিয়ে বসব মসনদে।
রাজমুকুট যাবে উড়ে। রাজসিংহাসন গড়াবে মাটিতে। তাও
আমরা দেখব।

বস নাম রহেগা আল্লাহ কা
যো গায়ব ভী হ্যায় হাজির ভী
যো মঞ্জর ভী হ্যায় নাজির ভী

নাম থাকবে শুধু আল্লার।
যিনি নেই আবার আছেনও।
যিনি সবেতেই দৃশ্যমান আর নজর রাখেন সর্বত্র।

উঠেগা অন— ল-হক কা নারা
যো ম্যায় ভি হু অওর তুম ভি হো
অওর রাজ করেগি খলক-এ-খুদা
যো ম্যায় ভি হু অওর তুম ভি হো

নারা উঠবে 'অহং ব্রহ্ম'—
আমার মুখে তোমার মুখে।
শাসনের রাশ ফিরবে খোদার নিজের লোকের হাতে—
আমার হাতে তোমার হাতে।

অনুবাদ আমার নিজের। উৎকর্ষ নয় কাজ চালিয়ে নেওয়াই উদ্দেশ্য। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা নিশ্চয়ই ইউটিউবে জাভেদ আখতার এবং অন্যদের অনুবাদে দেখে নেবেন।

জুলফিকর আলি ভুট্টোর নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন জিয়া। ১৯৭৯ সালে ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। আজীবন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট কবি ফ্যায়েজ প্রতিবাদ করেন এই কবিতায়। প্রতিবাদ ছিল দমন

নীতির বিরুদ্ধে এবং ইসলামিক মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যাঁরা ছিলেন জিয়ার পৃষ্ঠপোষক। কবিতাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন জিয়া। তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে খোদার মসজিদ থেকে মূর্তি উপড়ে ফেলার ডাক বস্তুত তাঁকেই সিংহাসনচ্যুত করার ডাক। আজকে আমাদের দেশের টিকিধারীরা ভাববে ফ্যায়েজ চাইছেন বাবরি মসজিদ থেকে রামলল্লার মূর্তি অপসারণ। কবিতার মজাই তাই। এক এক যুগে এক এক জনের মনে এক এক রকম মানে হয় তার।

ব্যান উপেক্ষা করে লাহোরে গান শোনান ইকবাল বানো। সে গান ইউটিউবে শুনলে বোঝা যায় লাহোরের মানুষ কতটা উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। এও বোঝা যায় কানপুর আইআইটির ছাত্রছাত্রীরা কেন এই গান গাইছিল। জিয়া শাড়িও ব্যান করেছিলেন তাই বানো গাইতে এসেছিলেন শাড়ি পরে। এও ছিল এক স্পর্ধার কাজ। তারপর পৃথিবী জুড়ে এই গান প্রতিবাদের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইআইটির এক প্রফেসর ছাত্রদের শাস্তি চেয়েছেন কারণ গানটি হিন্দু-বিরোধী। গানটি যেহেতু ক্ষমতার অপহরণ অপব্যবহারের বিরোধী একে হিন্দুত্ব বিরোধী বলা যেতেই পারে কিন্তু হিন্দুধর্ম বিরোধী কোনো মতেই বলা যায় না। জিয়া কি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন? তাই ব্যান করেছিলেন হিন্দু বিরোধী কবিতা? প্রশ্ন তুলেছেন জাভেদ আখতার।

ভারতে প্রতিবাদীর মুখে পাকিস্তানি কবির কবিতা কি শাসকেরই সুবিধা করে দেবে? মোদী বলতে পারবে ওই দেখো প্রতিবাদের পাকিস্তান লিঙ্ক? কিছুটা হয়তো হবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আইআইটি আইআইএম-এর ছাত্রছাত্রী রাস্তায় নামলে ন্যারেটিভ বদলাতে বাধ্য। মোদীর বস্তাপচা আপত্তি কত আর কাজে দেবে? 'বস নাম রহেগা আল্লা কা'— ফ্যায়েজের একথার মানে কী? ফ্যায়েজ কবিতাটি লেখেন পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে সে দেশের মানুষের জন্য। তাই শুধু আল্লার নাম থাকাই তো স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।

তাঁর কি লেখা উচিত ছিল 'ভগবান/আল্লা/জিশু/বজরঙ্গবলি'?

ফ্যায়েজ কোনোদিনই ধর্মভীরু ছিলেন না। তাঁর ঈশ্বরপ্রেম মিরজা গালিবের মতোই। আল্লার নাম নিয়েছেন নেহাতই প্রতীক হিসেবে। এই কবিতায় উনি আল্লার নাম করে থামেননি। আল্লার সম্বন্ধে যে দুয়েক কথা বলেছেন তা দেখলে বেদ উপনিষদের কথা সুফিদের কথা মনে পড়ে যায়। হিন্দুধর্ম বিরোধী হলে ও কথা তিনি বলতেন না। জাভেদ আখতার 'অন-অল-হকের' অনুবাদ করেছেন 'অহম ব্রহ্ম'। অবশ্যই এটা ইসলাম ধর্মের কথা নয়। ইসলামে জগতের সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এক নন। একাত্ম হয়ে যাবার কথা আছে অদ্বৈত দর্শনেই। এই কথা বলার জন্য ঔরঙ্গজেব এক সুফি সন্তকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আইআইটির অধ্যাপক একথা না জেনেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে থাকবেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে যাঁরা ঘৃণা করেন তাঁরা সবাই যে হার্ড ওয়ার্ক পছন্দ করেন তা নয়।

ভক্তের সামনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই তাও জাভেদ তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে ফ্যায়েজের অন্য কবিতার একটি লাইনের কথা বলেছেন। কবিতার নাম 'দুওয়া'— মানে প্রার্থনা।

এস আমরাও হাত তুলি। আমরা যারা ভুলেই গেছি প্রার্থনা করতে।

আমরা যারা মহব্বত ছাড়া কোনও খোদাকে চিনতে পারি না

এই কথা বলার সাহস এবং মানসিক উদারতা যার আছে তার হিন্দু বিরোধিতার কোন প্রয়োজন? সে তুলনায় ইকবাল ছিলেন কিছুটা ভারত বিরোধী। তাও মনে হয় তাঁর 'সারে জঁহা সে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা' গানটা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি।

১৯৫১ সালে ফ্যায়েজের নামে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনেন লিয়াকত আলি। জেল খাটতে হয়। ১৯৫৮ সালে কমিউনিস্ট হবার কারণে আবার জেলা। হিন্দুত্ববাদীর রোষে পড়ে উনি একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন।

নতুন 'নতুন দিল্লি'

অমিতাভ রায়

নতুন ভারত গড়বার আকাঙ্ক্ষায় পুরোনো কোনো কিছুই আর পছন্দের নয়। সরকারের নতুন সংস্করণ জন্মলগ্ন থেকেই নিত্যনতুন সমস্যার জন্ম দিয়ে চলেছে। নতুন শিক্ষা নীতির খসড়া প্রকাশ যখন প্রকাশিত হল তখন মন্ত্রিসভার বয়স মাত্র একদিন। মন্ত্রিসভার বয়স চারদিন হওয়ামাত্রই ঘোষিত হল জেলায় জেলায় বিদেশি চিহ্নিত করার জন্য দপ্তর স্থাপনের নির্দেশনামা। একে একে বেড়ে চলেছে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করার হাজারও পদ্ধতি। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লুপ্ত করে সমগ্র বিশ্বের থেকে সেখানকার মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে অযোধ্যা সমস্যার সমাধান হওয়ায় শাসকের স্বপ্ন পূরণ হল। এরমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে বহু শ্রম-অর্থ-লাঞ্ছনায় নির্মিত আসামের চূড়ান্ত নাগরিক পঞ্জি বা এনআরসি। এই তালিকা শাসকের লক্ষ পূরণ না করায় ছড়িয়ে পড়ল অসন্তোষ। সংসদে সংখ্যাধিক্যের দাপটে জারি হল নতুন আইন, সংশোধিত নাগরিক বিধি বা সিএএ। সবমিলিয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করল রাষ্ট্র। সারা দেশে তৈরি হল আশঙ্কা-উদ্বেগের এক পরিবৃতি। ফলাফল, দেশজুড়ে শুরু হয়েছে এক ভয়াবহ লড়াই। রাষ্ট্র বলছে, কাগজ (নথি) দেখাও। মানুষ সরাসরি জবাব দিচ্ছে, কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে।

সর্বব্যাপী আতঙ্কের এই পরিসরে কখন যেন চুপিসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে দেশের রাজধানীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ও ঐতিহ্যবাহী অট্টালিকার আর প্রয়োজন নেই। অথবা সেই বাড়িগুলি স্বপ্নের নতুন ভারতের উপযোগী নয়। কাজেই সেগুলিকে হয় ভেঙে ফেলা হবে অথবা তাদের অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে।

তালিকার শীর্ষে আছে সংসদ ভবন। নর্থ ও সাউথ ব্লক, নির্মাণ ভবন, শাস্ত্রী ভবনও এই নবনির্মাণের তালিকায় জায়গা পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের চত্বরেই নির্মিত হবে প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন। এখনকার রাষ্ট্রপতি ভবনের মধ্যেই তৈরি হবে জীব-বৈচিত্র্য উদ্যান বা পরিভাষায় বায়ো-ডাইভার্সিটি পার্ক। সাধারণত মানুষ ও পর্যটকদের জন্য সারা বছরই সেই উদ্যানের দরজা খুলে রাখা হবে। সত্যিই তো ওখানে প্রচুর জায়গা খামোখা পড়ে আছে। তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম নয়। রাজকোষ থেকেই সেই টাকা জোগাতে হয়। পর্যটকদের কাছে টিকিট বিক্রি করে সেই খরচের কিছুটাও যদি উদ্ধার করা যায় ক্ষতি কী! স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক এবং কর্মীবর্গ মন্ত্রকের প্রধান দপ্তরের ঠিকানা নর্থ ব্লক। রাস্তার অন্য পাশের সাউথ ব্লকে রয়েছে বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রদান দপ্তর। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকে বসে মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন। এমনকী সাউথ ব্লকের একটি সংযুক্ত অংশে অবস্থিত সেই বহু আলোচিত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা পিএমও। লোকে বলে এখন নাকি ওই দপ্তরই দেশ চালায়। এহেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভবন প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুসারে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দলগুলি নতুন ঠিকানা পাবে।

নির্মাণ ভবন আর শাস্ত্রী ভবন নতুন ভারতের উপযোগী নয়। অহেতুক প্রচুর জায়গা জুড়ে নাকি দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই এই দুটি বাড়িকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই জায়গায় বানানো হবে দশটি আটতলা বাড়ি। সেইসব ঝাঁ চকচকে আধুনিক বাড়িগুলি হবে নতুন কেন্দ্রীয় সচিবালয়। সমস্ত মন্ত্রকের সত্তর হাজার কর্মী-আধিকারিক সেইসব নতুন বাড়িতে বসে নতুন ভারতের প্রশাসন পরিচালনা করবেন। প্রতিটি বাড়ি আবার ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এখনকার সংসদ ভবনের অস্তিত্ব লোপ পেতে চলেছে। গড়ে তোলা হবে নতুন সংসদ ভবন। তার স্থাপত্যশৈলী নাকি এককথায় অনবদ্য। বারোশো সাংসদের বসার বন্দোবস্ত করা হবে। মন্ত্রী তো বটেই প্রত্যেক সাংসদের জন্য থাকবে আলাদা বসার ঘর এবং দপ্তর। সেই সংসদ ভবনের শব্দ প্রক্ষেপন ব্যবস্থা বা আকয়েস্টিক হবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ। নতুন বাড়িতে প্রাকৃতিক আলো হাওয়ার যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে নজর দেওয়া হবে। নবনির্মিত প্রতিটি বাড়ির বাইরের চেহারা নর্থ ব্লক এবং সাউথ ব্লকের মতো প্রস্তর

আচ্ছাদিত হলেও ভিতরে কিন্তু ইস্পাত এবং কাচের ব্যাপক ব্যবহার হবে।

সবমিলিয়ে এক ধুন্ধুমার ব্যাপার! একই সঙ্গে ধ্বংসযজ্ঞ ও নবনির্মাণের কাজ। এবং সময়সীমা কমবেশি দু থেকে আড়াই বছর। কত খরচ হবে? টাকা কোত্থেকে আসবে? জানানো হয়নি। অথবা জানানোর প্রয়োজন মনে হয়নি, তবে হবে। এমনকী লোকসভার স্পিকার সম্প্রতি কানাডায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ স্পিকার সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন যে ২০২২-এর প্রথম সংসদীয় অধিবেশন নতুন সংসদ ভবনেই বসবে। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর উদযাপনের জন্য এর থেকে ভালো উদ্যোগ আর কী হতে পারে!

ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন ২০১৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি মারফত সামগ্রিক প্রকল্পের ঘোষণা করে। সেই সরকারি বয়ানে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। এত বড়ো প্রকল্পের স্থপতি নির্বাচন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেরে ফেলা হয়। আহমেদাবাদের একটি স্থপতি সংস্থা ধ্বংস ও নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পেয়েছে। এই সংস্থাটি এর আগে আহমেদাবাদে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ করে শাসকের আস্থা অর্জন করেছে। সেই কারণেই হয়তো দরপত্র জমা দেওয়ার পরই তারা প্রকল্পের রূপরেখা ও নকশা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে। এবং সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিবৃতি থেকেই প্রকল্পের একটি আবছা অবয়ব আন্দাজ করা যাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের দুই দশক সময় ধরে তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রপতি ভবন বা তখনকার ভাইসরয়স হাউস। সেই স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে সমতা রেখে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রধান প্রবেশ পথের দুধারে নির্মিত হয় নর্থ ব্লক এবং সাউথ ব্লক। অদূরে তৈরি হয় আইনসভার বাড়ি যা এখনকার সংসদ ভবন। সেইসময়কার দুই প্রথিতযশা স্থপতির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নির্মিত হয়েছিল ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থাপত্য। হঠাৎ করে তড়িঘড়ি তাঁদের নস্যাৎ করে মাত্র আড়াই বছরের সময়সীমায় যে বিশাল কর্মকাণ্ডের সূচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। কোথাও কোনো আলোচনা নেই। বিশেষজ্ঞদের মত বিনিময়ের অবকাশ অনুপস্থিত। দরপত্র আহ্বান এবং স্থপতি নির্বাচনে এত দ্রুততা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু কে প্রশ্ন করবে? দেশের মানুষ এখন নিজের, পরিবারের এমনকী আগের প্রজন্মের ইতিহাস, নথি সংগ্রহে ব্যস্ত। আশঙ্কা-আতঙ্কে মানুষের জীবন জর্জরিত। আর সেই ভয়ের আবহে গড়ে উঠতে চলেছে নতুন 'নতুন দিল্লি'।

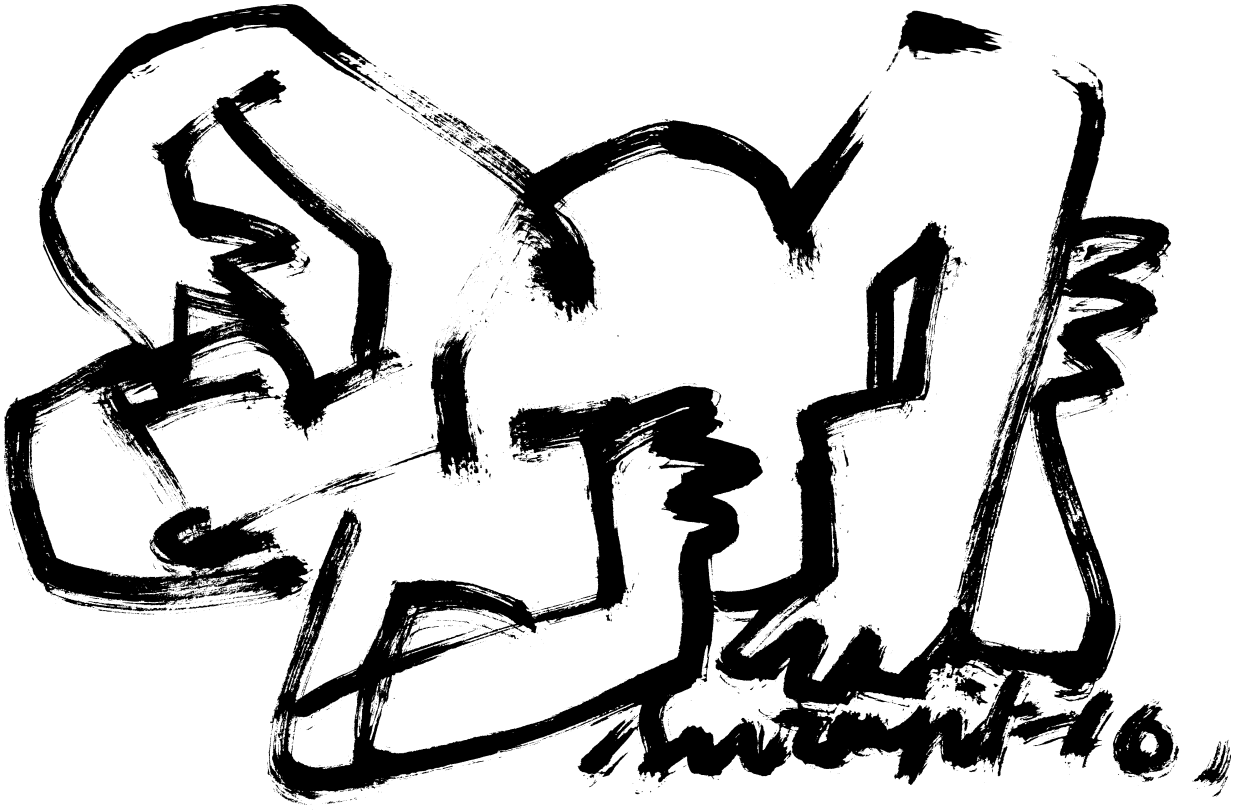

মিথ্যাচারে গণতন্ত্র বিকাশের সুযোগ কোথায়?

বরুণ কর

বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্ককে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় উত্তরের বদলে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিল, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রায়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে একথা বলা যায়, এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশের সুযোগ কম। ঐতিহাসিক নথিপত্র বা যুক্তি নয়, বিশ্বাস গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। সারা দেশে ঘটে চলা ঘটনাবলির বিশ্লেষণে উত্তরের বদলে আপনার মনে সত্যি ভেসে উঠবে নানা প্রশ্ন। কোনটা ঠিক এ নিয়ে ধন্দ যেন অন্তহীন।

দিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের হস্টেলের ঘরভাড়া ও মেসচার্জ বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের পরোক্ষ মদতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত। সংবিধান-স্বীকৃত শিক্ষার অধিকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাছাই করা মন্ত্রীরা ভরতুকিপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার তুলোধোনায় ব্যস্ত। করদাতাদের টাকায় এ হেন অপব্যবহার তাঁদের না-পসন্দ। শিক্ষাব্যবস্থার বেপরোয়া বেসরকারিকরণের পক্ষে সওয়ালে মাতোয়ারা প্রভাবশালী মিডিয়ার একাংশ। কর্পোরেট জগতের ক্ষেত্রে নানাবিধ ছাড়, কর হারে সংশোধন অব্যাহত। একের পর এক রাজ্যে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে সরকার গঠনে কেন্দ্রের শাসকদলের সক্রিয়তা গণতন্ত্রকে বেআবরু করলেও মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে একই কৌশল দেখা গেছে। ২৩ নভেম্বর দিল্লিতে রাজ্যপালদের দুদিনের সম্মেলন উদ্বোধন করে মাননীয় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অটুট রাখার ক্ষেত্রে রাজ্যপালদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানের ৭০ বর্ষপূর্তি ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল যাতে অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত মহিলা ও যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়, সেই বিষয়ে রাজ্যপালদের আরো যত্নবান হবার আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মহারাষ্ট্র সরকার গঠনের লক্ষ্যে বিধানসভার বদলে একটি পাঁচতারা হোটেলে একশো বাষট্টি জন বিধায়ক নাকি শপথ নিয়েছেন— 'এমন কিছু করব না যাতে বিজেপি-র সুবিধা হয়।' আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের সততা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় কোনো বিশেষ দলের সুবিধা বা অসুবিধার পরিবর্তে যদি বিধানসভার মেয়াদ পর্যন্ত গণতন্ত্র ও নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁরা বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতি শোনাতে পারতেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয়তো সার্থকতা খুঁজে পেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে কর্মসূচি রূপায়ণের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তার কত শতাংশ মান্যতা পায় তা প্রত্যেক দেশবাসী জানে। বেসরকারি শুধু নয়, সরকারি তথ্য-পরিসংখ্যানেও দেশের সার্বিক যে চিত্র ধরা পড়ে তা মেনে নিতেও মন্ত্রীদের কুণ্ঠাবোধ আমাদের নজর এড়ায় না। তাই মন্দায় নিমজ্জিত হলেও অর্থমন্ত্রীর ভাষণে তার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়ার উপায় নেই। রাজ্যে পরিবর্তনের পালা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার নানা প্রক্রিয়া রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। অম্বিকেশ মহাপাত্র, তানিয়া ভরদ্বাজ, টুম্পা কয়াল, মৌসুমী কয়াল এরা তো বিরোধিতার মাশুল গোনার কয়েকটি নাম মাত্র। ধর্ষণ কাণ্ডে সরকারি বয়ানে ভিন্নমত পোষণের খেসারত এক আইপি এস অফিসারকেও দিতে হয়েছে। স্কুল-কলেজের পরিচালন সমিতি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত, পুরপ্রতিষ্ঠান এমনকী বিধানসভা, লোকসভাতেও বিরোধীদলের অস্তিত্ব মুছে দেবার হুংকার নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে নিচুতলা পর্যন্ত প্রসারিত। অন্য দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজ্যের উন্নয়ণে সামিল করার কৃতিত্বের এক মহান কারিগর নিজেই দল বদল করে এখন কেন্দ্রের শাসকদলে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার কাজে ব্যস্ত। সরকারি প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপনে, মিটিং-এ-মিছিলে একটিই মুখ, যাঁর অনুপ্রেরণা ব্যতিরেকে পাখিও ডাকে না রাজ্যে। অথচ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ঢাক ঢোলে বিরাম নেই। এরই মধ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত তিনটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শাসকদল যথারীতি

সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচনি সমঝোতার কোনো সুফল বামফ্রন্ট বা কংগ্রেস কেউই পায়নি। পাওয়ার কথাও নয় বোধহয়। জনমানসে কংগ্রেস দলটির গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে। দলবাজি, দুর্নীতি সহ নানা অপরাধের পৃষ্ঠপোষকতার কাজটি তারা গত সাত দশকে বেশ যত্ন সহকারে চালিয়ে গেছে। সারা দেশে বামেদের অবস্থান নড়বড়ে। গোনা-গুনতি দু-তিনটি রাজ্য সরকার পরিচালনা করলেও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃঢ় মনোভাবের অভাব বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট। এই রাজ্যের অধিবাসী হিসেবে যে কথাটি বলার তা হল— চৌত্রিশ বছরের শাসনের সদর্থক যা কিছু তা ধুয়ে মুছে গিয়েছে নেতৃত্বের বিচক্ষণতার অভাবে। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' প্রশাসনের প্রাথমিক এই দায়িত্ব নির্বাহের ক্ষেত্রে ঢিলেমি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু তো বটেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন স্তরে দলীয় কোন্দলের প্রভাব। ফলত, জনসাধারণ তথা রাজ্যবাসীর চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্খা অপূর্ণ রয়ে গেছে। অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসু বারবার মনে করিয়ে দিতেন জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর কথা। তাদের অভাব অভিযোগ শুনে তার প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থার কথা। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম হবার পর, ভূমি সংস্কারের ফল সমাজজীবনে অনুভূত হবার পর, শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের পর বাম শাসনের প্রভাব রাজ্যে যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, জনজীবনের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও ততই উপলব্ধ হয়েছে। এই উপলব্ধিকে মান্যতা দেবার জন্য রাজ্যে পরিকল্পনা পর্ষৎ গঠন সহ নানা কর্মকাণ্ড শুরু করা হলেও সে সব ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব ছিল স্পষ্ট। অগ্রাধিকার গেছে গুলিয়ে এবং অনেক কিছু করা বাকি থেকে গেছে। গ্রামের তুলনায় শহর বা শহর-ঘেঁষা অঞ্চলের প্রতি ছিল বাড়তি মনোযোগ। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয় যা প্রশাসনের বাড়তি নজর দাবি করে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। লজ্জার কথা, বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়ুয়াদের ও নিত্যযাত্রীদের পারাপারের ছবি স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও সংবাদপত্রে শোভা পায়। স্থানীয় দাবি মেটানোর তাগিদও তেমনভাবে উঠে আসে না কোনো বিক্ষোভ কর্মসূচি বা দলীয় কর্মসূচিতে। গণসংগঠনগুলো নিজস্ব ভাবনা চিন্তার বদলে মূল দলটির কর্মসূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার কারণে সংগঠনের বহমানতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কর্মীদের মধ্যে দলীয় ইস্তাহার, পত্র-পত্রিকা পড়ার প্রবণতা নেই বললেই চলে। ওপর ওপর কিছু ধ্যান ধারণা একমাত্র সম্বল। বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় প্রচারের মূল সুরটিও তাই ধরা যায় না। সভাসমিতিতে বক্তৃতায় বা আলোচনা সভাতে অধিকাংশ বক্তার বক্তব্য বিষয় ছড়িয়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করার ফলে শ্রোতা সাধারণ বুঝেই উঠতে পারেন না তিনি সভায় কী কারণে গিয়েছিলেন। গত বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে বেশ কিছু নেতা দুটি দলের 'সেটিং' নিয়ে তত্ত্ব আউড়ে গেলেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো গেল না সেটিং-এর জায়গাগুলো। কী কেন্দ্র কী রাজ্য গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কাঠামো যেভাবে আক্রমণের সম্মুখীন তা রাজ্যবাসীকে বোঝানো গেছে কি? স্বচ্ছতার বড়াই করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সাফাই গাওয়া অব্যাহত। সারদা রোজভ্যালি সহ সব কেলেঙ্কারির সদুত্তর আজও অজানা। নির্বাচনি তহবিলে কোন কোন মহল থেকে কোন কোন দল কী পরিমাণ আনুকূল্য পেল তার হদিশ পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। বিজেপি সচিব ভূপেন্দ্র যাদব ১৭ আগস্ট, ২০১৭ তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অরুণ জেটলিকে এই মর্মে চিঠিও লেখেন, নির্বাচনি বন্ডে যেন কোনো ক্রমাঙ্ক না থাকে। এতে ভবিষ্যতে নাকি সাহায্যকারীদের চিহ্নিতকরণের কাজ সহজ হবে।

'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' স্লোগান শুধু সরকারি বিজ্ঞাপনেই স্থান পেয়েছে। দেশ জুড়ে নারী নির্যাতন থেমে নেই। নির্যাতনকারীদের সাজা দেবার বদলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্রান্ত বা তাদের পরিবারকে আইনি জটিলতায় নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে। একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার অংশীদারিত্ব ছাড়ার নেশায় কেন্দ্র বিভোর। নতুন কর্মসংস্থানের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু শ্রমবিলে সংশোধনী এনে কর্মী ছাঁটাইয়ের রাস্তা পাকা। এন.আর.সি.'র আতঙ্ক দেশবাসীকে ক্রমেই গ্রাস করছে। 'সব কা সাথ সব কা বিকাশের' ফানুশ কিন্তু উড়ছে।

এমতাবস্থায় বামপন্থীরাই দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজন শুধুমাত্র জনসাধারণের মৌলিক দাবিগুলি অগ্রাধিকারে রেখে দাবি সনদ প্রস্তুত করে তা জনসমক্ষে হাজির করা। প্রথম ইউপিএ সরকারের যেভাবে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি রাখা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির কাছে আহ্বান রাখা হোক কারা ওই কর্মসূচি রূপায়ণে সচেষ্ট থাকবে। সেই কর্মসূচির সঙ্গে সংগতি রেখে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে সংগঠিত হোক ধারাবাহিক আন্দোলন। দলীয় স্বার্থকে পাশে সরিয়ে রেখে জনগণের দুর্গতি মোচনের কাজকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে গড়ে উঠুক মেহনতি মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ জোট। মন্দির-মসজিদ নয়— খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য সহ জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে কীসের বিলম্ব! গোঁড়ামি বর্জন করে মান্যতাপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের পরামর্শ মাফিক সমাজ ও অর্থনীতিকে পরিচালিত করার সর্বজনগ্রাহ্য বিকল্প নীতি তুলে ধরা হোক। সস্তার নির্বাচনি সমঝোতা নয়,

জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের কাজ তরান্বিত করার কাজ শুরু হোক এখনই। পথই একমাত্র পথ। পথে নেমেই পথ চিনে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে এগিয়ে চলায় আর গড়িমসি নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক জায়গায় বলেছেন সমাজ পিছিয়ে পড়ে নৈতিক শক্তি চুপসে গেলে। নৈতিক শক্তি যে চুপসে গেছে তার সহস্র উদাহরণ চোখের সামনে। বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণ সহ নানা মিথ্যাচার যেন বিরক্তিকর পর্যায়ে পৌঁছেছে। সত্যের মুখোমুখি না হয়ে সত্যকে আড়াল করে মিথ্যাকে সত্যি বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে বাস্তবে গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানা হলেও সংসদভবনে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ছবি দেশবাসীকে দেখতে হয়। সরকারের নীতি রূপায়ণে ব্যর্থতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর ছবি শোভিত পাতাজোড়া বিজ্ঞাপনে সংবাদ মাধ্যমের পোয়াবারো। তদন্তমূলক প্রতিবেদনের বদলে তাই মালিকের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় সাংবাদিককুল উদ্‌বাহু।

তাই ভালো-মন্দের ধোঁয়াশা না রেখে, আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে না মেতে সত্যিকে সত্যি বলে চেনাবার দায়িত্ব বামপন্থীদেরই নিতে হবে। সোজা কথা সোজা ভাবে বলার অভ্যাস করতে হবে। অতীতের কৃতকর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি না খেলে জনসাধারণের দুর্দশা মোচনের কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। জনসাধারণই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে দলীয় কোন্দল, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ প্রাধান্য পায় কীভাবে! মনে রাখা দরকার চোরাপথেই মিথ্যার কারবারিরা তাদের পসার বাড়িয়ে তোলে। চাটুকারের দল (বিশেষত এ রাজ্যে) বুদ্ধিজীবী সেজে সান্ধ্য মজলিশ আলো করে এবং ধুয়ো তোলা সাংবাদিককুল মুচকি হেসে দায় সারে। জনসাধারণ থাকে তিমিরেই। জনসাধারণকে উপলক্ষ করে তাদের সঙ্গেই প্রতারণার এই তামাশা এখনই বন্ধ হোক। দূর থেকে মজা দেখা নয়; প্রলোভনের হাতছানি উপেক্ষা করে প্রতারকদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলার উদ্যোগে আপনাকেও সামিল হতে হবে।

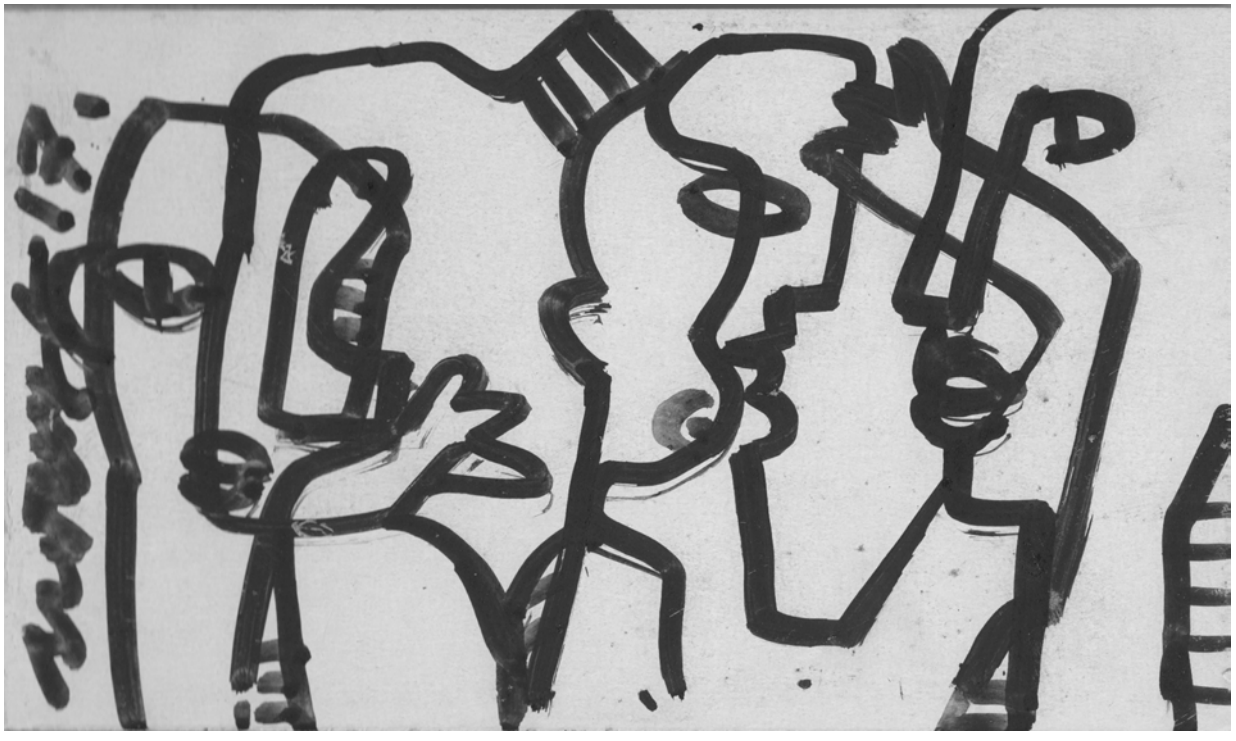

সুন্দরবনের অন্দরমহল

কথাকলি মৌলিক

মোহময়ী অরণ্য

প্রাকৃতিক বিস্ময়গুলির অন্যতম সুন্দরবন বাংলার গর্ব বিশ্বের বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম হাতিয়ার। যে ভ্রমণ পিপাসুরা এর জলে জঙ্গলে, খাঁড়ির অন্তরালে সৌন্দর্য খুঁজে পান, এই অরণ্যের অভ্যন্তরে বাস করা মানুষজন, পশু পাখি, জলজ প্রাণী এবং তাদের জীবন ধারণ, বাঁচার লড়াই, আক্ষরিক অর্থেই জলে কুমির ডাঙায় বাঘ নিয়ে, বেঁচে থাকার অনুসঙ্গগুলো সম্বন্ধে তাঁরা বেশি ওয়াকিবহাল নন। সুন্দরবনে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে ৫৪টি দ্বীপকে ঘিরে, প্রায় ৩৫০০ কিমি নদী বাঁধ তৈরি হয়েছে কোনোরকম আধুনিক বিজ্ঞান বা কারিগরি জ্ঞানের সাহায্য না নিয়েই। ১৯৬৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তর এই দায়িত্ব নেয়। তা সত্ত্বেও নদী বাঁধ সংরক্ষণ বা পুনর্নির্মাণের জন্য যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা আজও করা হয়নি। প্রকৃতির অকৃপণ হাতে সৃষ্ট এই মোহময়ী অরণ্যের অপার সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে আমাদের যা করণীয় ছিল তার সামান্যতম অংশও যদি করতে পারতাম, তা হলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঝড় ঝঞ্ঝার আঘাতে এই বাস্তুতন্ত্রের যেটুকু ক্ষতি হয়েছে সেটুকুও হত না। সুন্দরবন প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এই অরণ্যের মানুষের স্বার্থে, তার পশু পাখি এবং খাঁড়ির জলে বেঁচে থাকা বিভিন্ন জলজ প্রাণীর স্বার্থেই বিশেষভাবে প্রয়োজন।

প্রকৃতির আক্রোশে সুন্দরবনের ভৌগোলিক ক্ষয়ক্ষতি

বর্তমান সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা দুটির বঙ্গোপসাগরের সীমা সংলগ্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল জুড়ে প্রায় ৪,২০০ বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত অরণ্য এবং ৫,৪০০ বর্গ কিলোমিটার সাধারণ অরণ্য। মোট জলভাগ ১,৮৭৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। এই অরণ্য বাংলাদেশের পশ্চিমদিকে হরিণভাঙা, রায়মঙ্গল, কালিন্দী ইত্যাদি নদী অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সঙ্গেই এর বন্যপ্রাণী সম্পদও বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছে (চক্রবর্তী ২০০৯)। টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট-এর হয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে কাজ করার সময় শ্রীতুষার কাঞ্জিলাল মহাশয় তাঁর একটি গবেষণাপত্রে ব্যাখ্যা করেছেন যে ২০০৯ সালের আয়লার আঘাতে সুন্দরবনের ৩৫০০ কিমি. নদী বাঁধের ৭৭৮ কিমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সুন্দরবনের পশ্চিমবঙ্গের অংশে ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে প্রকৃতিদত্ত গাছপালা বন জঙ্গল আমরাই ধ্বংস করে দিয়েছি। বাদাবনের অস্তিত্ব এখন মাত্র ৪৮টি দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে নিবিড় বাদাবনের কাজই ছিল ঝড়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলানোর সেই দেওয়ালটাই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। এর পরিণাম যে কী হবে সেই ভাবনাটাও ভাবতে শুরু করিনি। মাননীয় শ্রী কাঞ্জিলাল মহাশয় তাঁর সুন্দরবনবাসীর প্রতি আবেদন শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন—

‘৪/৫ মাস গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হলে যেমন শিশু বাঁচে না তেমনই সুন্দরবনের মানুষকে আজকের যে দুর্ভোগ এবং বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে তার মূল কারণ পলি জমে দ্বীপ অনেকটা উঁচু না হতেই মানুষ সেখানে বসতি গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই বসতি গড়ে তুলতে গিয়ে অবৈজ্ঞানিক এবং প্রকৃতি বিরোধী কাজটি ভবিষ্যতের কথা না ভেবে যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কেউই এখন বেঁচে বা ক্ষমতায় নেই। সুন্দরবন ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সুন্দরবনবাসীকে এর দাম দিয়ে যেতে হবে।’ (কাঞ্জিলাল ২০০৯)

আন্তর্জাতিক বায়ুমণ্ডল ক্রমশই উত্তপ্ত হচ্ছে। পাহাড়ের বরফ গলে গিয়ে নদীর জল ক্রমশ বাড়ছে। ওই ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ২টি দ্বীপের অস্তিত্ব উপগ্রহ চিত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ সমুদ্র তাদের গিলে খেয়েছে (কাঞ্জিলাল ২০০৯)।

১৯৮৫ খ্রি. ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এই প্রশস্ত বনভূমি। এই অরণ্যকে জালের মতো জড়িয়ে আছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদাচর, এবং পৃথিবীর বৃহত্তম এবং একমাত্র

ম্যানগ্রোভ অরণ্য সহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত একটা হিসেবে দেখা গেছে, এই অঞ্চলে বাঘ প্রতি বছর প্রায় ১৬০০ মানুষ মেরেছে (চক্রবর্তী ১৯০৬)। ১৮৭৮ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন বাড়ানো এবং বিভিন্ন প্রকার কাঠের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষে। অরণ্যের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার ফলে এই বনাঞ্চলে ওই সময় বহু কুলি মজুরই বাঘের শিকার হয়। ব্রিটিশরা ধরেই নেয় যে সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঘই নরখাদক। ১৮৮৩ সালে ১৬ নভেম্বর কলকাতা গেজেট-এ প্রকাশিত নোটিফিকেশন-এ দেখা যায় সরকার সেই সময় দক্ষ শিকারিদের এবং বনদপ্তরের রেঞ্জার ইত্যাদিদের বাঘ মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। শুরুতে যা ছিল পূর্ণবয়স্ক বাঘের জন্য ৫০ টাকা আর শাবকের জন্য ১০ টাকা। সেটা বেড়ে ১৯০৬ সালে হয় যথাক্রমে ১০০ টাকা এবং ২০ টাকা। ফলে ১৯০৬-১৯০৯-এর মধ্যে ৫০০ বাঘের মৃত্যু হয়। ১৮৮১-১৯১২ এর মধ্যে সরকারি দাক্ষিণ্যেই প্রায় ২৪০০ বাঘের মৃত্যু হয় (চক্রবর্তী ১৯০৬)। Ranjan Chakrabarty' তাঁর লেখায় বলেছেন— 'The Annual Reportgs of the Forest Department, however, from which I derived the figure, do not take tally of those killings that took place outside the forest area or were not reported to the Department' (চক্রবর্তী ১৯০৬)।

সুন্দরবন এবং বাংলাদেশি শরণার্থী

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে ১০০০০ বর্গ কিলোমিটার অরণ্য বর্তমানে প্রায় ৬০০ বাঘের স্বাভাবিক বনভূমি। স্বাধীন ভারতে বাঘের বৃদ্ধিতে সরকার খুশি। ১৯৫০ থেকে শুরু করে ৬০-৭০ দশক জুড়ে যখন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে বাঙালি হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করে, তখন তাদের অনেকেই সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করে। সুন্দরবনের বাঘেদের মানুষখেকো হয়ে ওঠার কারণ বাঘেদের বসবাসের জন্য সুন্দরবনের জঙ্গল এবং তার পরিবেশ অনুকূলে ছিল না, ফলে বাঘেদের স্বভাবের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। একই সময় বাঘকে জাতীয় পশুর মর্যাদাও দেওয়া হয়। সুন্দরবনকে মূলত বাঘেদের আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ১৯৭৮ সালে প্রায় দেড় লক্ষ শরণার্থী দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তারাও সুন্দরবনে থাকতে শুরু করে। সেখানকার জলে জঙ্গলে, মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে তারা সংসার পাতে। এখানকার স্বাভাবিক অরণ্য কেটে ফেলে ঝাউ এবং নারকেল গাছের চাষ শুরু হয় সরকারিভাবে। সুন্দরবন ছাড়াও লাগোয়া সাতজেলিয়া, কুমিরমারি, পুঁইজালি, ঝরখালি ইত্যাদি দ্বীপেও শরণার্থীরা বসতি স্থাপন করে।

বিশ্বঐতিহ্য এবং সুন্দরবনের সাধারণ মানুষ

সুন্দরবন ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। প্রশ্ন জাগে এটা কাদের জন্য? সুন্দরবন নিয়ে কিছু লিখতে গেলে এই অরণ্যের মানুষদের বাদ দিয়ে লেখা কখনোই সম্ভব নয়। এই অরণ্য নিয়ে, সুন্দরবনের মানুষদের বোধ এবং উপলব্ধি কী সেটা ভাবনায় না রেখে সুন্দরবন সম্পর্কে কথা বলা বা আলোচনা করা অর্থহীন। সুন্দরবনের দ্বীপবাসীদের জীবন জীবিকার মূল উৎস যে বনাঞ্চল, তাকে রক্ষা করার উপরই সুন্দরবনবাসীরা সবসময় জোর দিয়েছে (Jalais 2007)। সুন্দরবনের মতো অঞ্চলে পশু অথবা প্রকৃতিকে আলাদাভাবে বিভাজিত করা সম্ভব নয়। বরং ঐতিহাসিক এবং নৈতিকভাবেই এখানকার মানুষের প্রকৃতিগত আচার আচরণ, অভ্যাসের সঙ্গে পশু সমাজের একটা স্বাভাবিক সংযোগ তৈরি হয়েছে। তার জন্য প্রকৃতি, মানুষ বা পশুর মধ্যে কোনোরকম জটিলতা বা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়নি। বরং সুন্দরবনবাসী এবং তাদের ঘিরে থাকা বন্য প্রাণীকুলের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সুন্দরবনবাসীর দাবিগুলি নিয়ে শহরের মানুষদের মধ্যে একটা অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ করা গেছে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে জল আর জঙ্গলে ডুবে থাকা একটা অঞ্চল কীভাবে একটা ঐতিহ্যবাহী অরণ্যে রূপান্তরিত হল, সুন্দরবনের কথা বলতে গেলে এই ভাবনাটা সবসময় উঠে আসে। এর জন্য এই বনাঞ্চলের অধিবাসীদের অনেক কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকারের অবদান অবশ্যই ছিল। প্রশাসনিক স্তরে এই বনাঞ্চলের প্রকৃতির যে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা ছাড়াও সুন্দরবনের দুই বাংলার (বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ) অংশে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে এবং সুন্দরবনের অরণ্য সম্পদের সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষ যখন পরিচিত হয়ে উঠছে তখন কিন্তু নিঃশব্দে গ্রামগুলি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল। তখনই প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বঐতিহ্য কাদের জন্য?

সুন্দরবন এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা Annu Jalais-র লেখায় আমরা জানতে পারি। সুন্দরবনবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে যাচ্ছিল। ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝরখালি দ্বীপে 'পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র' স্থাপনের পরিকল্পনা করে তখন ওই দ্বীপবাসীদের মনে এই ধারণাটা আসে। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল সুন্দরবনের ওই দ্বীপের দারিদ্র্য অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নয়নে সাহায্যের কথা ভেবেই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে

বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিবেশ ধ্বংস হতে পারত। যদিও সেটা হয়নি। পরমাণুবিরোধী জোরদার প্রচারে শেষপর্যন্ত সরকার পিছু হটে এবং এই প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অমিতেশ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখায় জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করতে যখন উদ্যোগী হয় তার দু বছর আগে বামপন্থীরা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্থানের পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষার চরম বিরোধিতা করেছিল। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে সরকারের যুক্তি ছিল এই প্রকল্প দারিদ্র্য সংকুল এলাকার উন্নয়নের সাহায্য করবে। সুন্দরবনের ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বোমার কোনো পার্থক্য ছিল না। পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ায় আশেপাশের ঘরবাড়ি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশ বাঁচানোর জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছিল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কিন্তু পরিবেশ কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। এর বিরোধিতায় পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ২০০০ সালে জুলাই মাসে পরমাণু বিরোধী ফোরাম একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। সেখানে এই বিষয়গুলি উঠে আসে যে আদতে সুন্দরবনবাসীরা এই প্রকল্পে লাভবান হবেন নাকি আরেকটা দুর্যোগের শিকার হবেন। এই প্রকল্প থেকে উদ্ভূত বিকিরণে মৃত্যু ছাড়াও শারীরিকভাবেও মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে। সুতরাং দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই প্রতিবাদ করাটা প্রয়োজন। এই প্রতিরোধ ভারতবর্ষে বাস্তুতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে একটা অংশ ছিল বলা যায়। তীব্র আন্দোলনের চাপে অবশেষে সরকার এই প্রকল্প বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় (মুখোপাধ্যায় ২০০৫)।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা

এত ঝড় বয়ে যাওয়ার পরেও প্রকৃতির বিস্ময় সুন্দরবন দাঁড়িয়ে আছে আপন গরিমায়। সরকারও নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে সুন্দরবনে টিকে থাকা মানুষ, অরণ্য, প্রাণীকুল সবাইকে বাঁচিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে। শুরু হয়েছে বাঘেদের নিয়েই বেঁচে থাকা, জীবন জীবিকার লড়াই, সন্তান প্রতিপালন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাই করে চলেছে এই অরণ্যের মানুষেরা। পুরুষরা মধু সংগ্রহ, অরণ্যের কাঠ কেটে আনা, আর স্ত্রীরা মাছের মীন এবং কাঁকড়া সংগ্রহ এই জীবিকায় জড়িয়ে থাকে। সঙ্গে থাকে মৃত্যুভয়। পদে পদে আতঙ্ককে সঙ্গী করে চলে মধু সংগ্রহের, মীন সংগ্রহের কাজ। এই অরণ্যবাসী মানুষদের আর্থসামাজিক অবস্থা এমনই জায়গায় যে এরা বাধ্য হয় জীবন বাজি রেখে এই কাজগুলি করতে।

মানুষের মাংস খাওয়ার প্রতি বাঘেদের যে প্রবণতা সেটা দূর করতে সরকার এখন নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে এই অঞ্চলে স্বচ্ছ মিষ্টি জলের পুকুর কেটে তার চারপাশে হুবহু মানুষের মতো দেখতে মূর্তি বসানো হয়েছিল যার মধ্যে বিদ্যুৎ বাহিত হত। এ ছাড়াও এই অঞ্চলে বিনামূল্যে ২৫০০ মুখোশ বিলি করা হয়েছিল। এটা ব্যবহার করত সাধারণ মধু সংগ্রাহক এবং কাঠুরেরা। এতৎসত্ত্বেও বছরে গড়ে এখনও ১৫০ জন মানুষ বাঘের আক্রমণে মারা যায় (কাঞ্জিলাল ২০০৯)।

সুন্দরবন এখন ভারতবর্ষের ৯টি বাঘেদের জন্য সংরক্ষিত অরণ্যের একটি। সুন্দরবনের কোর এরিয়া (যেখানে সরকারি আধিকারিক এবং Tiger Reserve-এর কর্মীরা ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার নেই) নির্দিষ্ট করা হয়েছে বাঘেদের নিরুপদ্রব প্রজনন ক্ষেত্রের জন্য এবং তাকে ঘিরে বাফার জোন যেখানে সীমিত সংখ্যক বনবাসীকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় অরণ্যের সম্পদ সংগ্রহে। তবুও চোরা পথে কোর এরিয়ায় ঢুকে খাঁড়িতে মাছ ধরা বা চোরা শিকার চলছে। বাঘের আক্রমণে মারাও যাচ্ছে মানুষ। বাঘ-মানুষের মধ্যে এই লড়াইটা একটা আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ফলেই উদ্ভূত বিষয়। গভীর অরণ্যের মধু সংগ্রহ বা কাঠ সংগ্রহ, খাঁড়ির জলে মাছের মীন সংগ্রহ ইত্যাদি কারণে মানুষ সব সময় অরণ্যে প্রবেশ করছে। সেখানে গিয়ে বাঘের আক্রমণে প্রাণ গেলেও সরকারি শাস্তির ভয়ে তাদের বিধবা স্ত্রী আর পিতৃহীন সন্তান কাঁদতেও ভুলে যায়। মৃত্যুর সঠিক কারণটাও বলে না। এখন সরকারি স্তরে এই মানুষগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিনিয়িত দায়িত্বশীল আধিকারিকরা এইসব মানুষদের মধ্যে গিয়ে মধু উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষিত করছে যাতে গভীর অরণ্যে মধু সংগ্রহে গিয়ে মৃত্যুর কবলে না পড়তে হয়। বিধবাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি না পায়। সরকারি স্তরে তাদের শিক্ষিত করার বিভিন্নরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নানারকম সংস্কার বশে এরা নিজেরা বনবিবির পূজা-সহ কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেমন— মাথার পিছনে মুখোশ লাগিয়ে শরীরের পিছনের অংশে বা শিরদাঁড়ায় বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে প্যাড জাতীয় জিনিস ব্যবহার করে।

সুন্দরবনবাসী এবং তাদের সংস্কার

সুন্দরবনের জঙ্গল আর খাঁড়ির জল, সুন্দরবনবাসীর জীবন জীবিকার একমাত্র মাধ্যম। সমস্ত ভয়-ডর উপেক্ষা করে পুরুষদের জঙ্গলে যেতেই হয়। মহিলাদের যেতে হয় খাঁড়ির জলে জীবিকার সন্ধানে। হিন্দু-মুসলিম জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মধু সংগ্রহে যাওয়ার আগে বনবিবির পুজো সুন্দরবনবাসীদের অবশ্য পালনীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে। জীবনের প্রত্যেকটা

দিন কাটে খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে। সেই অনিশ্চয়তা নিয়েই চলতে থাকে তাদের নিত্য দিনের জীবনযাত্রা। সরকারি বিধিনিষেধকে কার্যত উপেক্ষা করেই গভীর অরণ্যে (সরকারি কোর এরিয়ায়) চলতে থাকে মধু সংগ্রহ, কাঠ কাটা। কুমির ভরতি খাঁড়িতে মাছের মীন এবং কাঁকড়া সংগ্রহ, যেখানে তাদের সঙ্গী থাকে মৃত্যু! সাহানা ঘোষের একটি প্রবন্ধ (২০১৮) থেকে জানা যায় যে বিগত ১৫ বছরে সুন্দরবনে ১১১জন মানুষ (পুরুষ ৮৩ এবং মহিলা ২৮) পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। যার মধ্যে ৭৪% মারা যায় আর পশু-মানুষের এই সংঘাত সংরক্ষিত অরণ্যের চারপাশে জীবিকা অর্জনে গিয়েই ঘটেছে। বাঘে-মানুষে এই দ্বন্দ্ব এখানকার মানুষের চিন্তা ভাবনার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই কাজে বেরোবার আগে সংস্কারের বশে সুন্দরবনবাসীরা কিছু আচার নিয়ম পালন করে থাকে। যেমন—

১) এখনও যারা মধু সংগ্রহে গভীর জঙ্গলে যায়, তাদের স্ত্রীরা সারাটা দিন বিধবার বেশে আচার নিয়ম পালন করে। যেমন, নতুন চালের মুড়ি না ভাজা, নতুন কাপড়, শাঁখা, সিঁদুর, আলতা না পরা। বন থেকে পুরুষরা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত চুল না বাঁধা। জামাকাপড় পরিষ্কার এমনকী সাবান ব্যবহার না করা। ঘরের আবর্জনা এবং রান্নাঘরের ছাই বাড়ির বাইরে না ফেলা। এমনকী রান্নায় পাঁচফোড়ন ব্যবহার না করা। তাদের চিন্তা থাকে যে স্বামীরা জঙ্গল থেকে আর বুঝি ফিরবে না। জঙ্গলের আলো আঁধারিতে লুকিয়ে থাকা হিংস্র বাঘের আক্রমণেই তাদের মৃত্যু হবে। এদের স্ত্রীরা দিনের পর দিন এইভাবেই বাঁচে (নিয়োগী ১৯৯৬)।

২) সুন্দরবনের জঙ্গলে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খাঁড়িপথ পেরিয়ে তারা জঙ্গলে পাড়ি দেয়। বনবিবির থানে পুজো দিয়ে, মধু সংগ্রহই হোক বা কাঠ কাটতে যাওয়া, নৌকাই তাদের একমাত্র বাহন। আর হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বনবিবি তাদের আরাধ্যা দেবী। বনবিবি, বনদেবী, বনদুর্গা, ব্যাঘ্রদেবী নামেও পরিচিত। তারা বিশ্বাস করে দেবীই তাদের রক্ষা করবে। তেমনই বিশ্বাস করে তাদের নৌকাকে। পাড়ে যাওয়ার আগে নৌকার সঙ্গে তারা কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে, যে পাড়ে নৌকা বাঁধছে সেখানে কোনো বিপদ আছে কিনা। তাদের বিশ্বাস বিপদ থাকলে স্রোতের টানে নৌকা ভেসে অন্যদিকে চলে যাবে।

৩) সুন্দরবনবাসীরা গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ বা কাঠ কাটতে নেমে একে অপরকে নিজেদের নামে না ডেকে 'ও' অথবা 'ওই' বলে সম্বোধন করে থাকে। আসলে এমন এক জীবন মরণের কঠিন লড়াই-এর মধ্যে তারা থাকে, যে নাম ধরে ডাকতেও তারা ভয় পায়। এই বুঝি বাঘ বুঝতে পারল আর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার শরীরটার ওপরে। ভয়াবহ এই জীবনযাত্রা। গভীর অরণ্যে, যেখানে দারিদ্র্য, বাঘ আর কুমিরের সঙ্গে চলে নিরন্তর লড়াই। প্রতিদিনের এই লড়াই ছাড়া তাদের উপায়ও কিছু নেই। মৃত্যু সর্বক্ষণ তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। গহন অরণ্যের গভীরে দুটো জ্বলন্ত চোখ তাক করে আছে, এক থাবায় তাদের চোয়াল খুলে নিতে। তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে গলার নলিটা কেটে দিতে। এটা তারা জানে, তাও রক্ত ঘামে ভেজা শরীরগুলোকে টেনে নিয়ে চলে সেই লড়াইয়ের পথেই।

সুন্দরবনের বাঘবিধবা এবং তাদের জীবনধারণ

সুন্দরবনের অরণ্যে বাঘের আক্রমণে মৃত মানুষের স্ত্রীদের আঞ্চলিকভাবে 'বাঘবিধবা' বলে সম্বোধন করা হয়। এই সমস্ত বিধবা স্ত্রীদের অনেকেই কাছাকাছি শহরে চলে যায় অন্যান্য কাজের জন্য। আবার অনেকেই জীবনধারণের জন্য সুন্দরবনের গ্রামেই থেকে যায়। সুন্দরবনের অনেক গ্রামেই এইরকম বিধবাপাড়া গড়ে উঠেছে। তারা খাঁড়িতে কাঁকড়া বা মাছ ধরার কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে। তাদের আস্থা থাকে তাদের অভিভাবক 'বনবিবির' ওপর। অনেকে আবার যুক্ত হয় কৃষিশ্রমিকের কাজে। এইসব বিধবা রমণীদের মানসিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির সঙ্গে আশ্চর্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানষিক আতঙ্ক কাটানোর জন্যই তারা এই সমস্ত কাজে ডুবে থাকে। এদের ভীতি দূর করতে সরকারি স্তরে সেরকম উদ্যোগও নেওয়া হয়নি (ঘোষ ২০১৮)।

সুন্দরবন এবং মহিলা স্বনির্ভরতা

সুন্দরবনের মতো দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আয়লা বা বন্যা এখানকার চাষযোগ্য জমিকে প্রায়ই লবণাক্ত জলে ভাসিয়ে দিয়ে যায়। ফলে বছরের পর বছর ওইসব জমিতে চাষের কাজও করা যায় না। প্রাণী সম্পদও প্রচুর মারা যায়। এখানকার মানুষজন তাই প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে জৈবচাষের উপর বেশি জোর দেন (ঘোষ ২০১৮)। বিশেষ করে এখানকার মহিলারা জৈব পদ্ধতিতে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং বিপণনের জন্য সমবায় পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছেন। সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি বসবাসযোগ্য। এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে উন্নত বাসন্তী ব্লকের চৌরঙ্গী গ্রামের ৪৯ শতাংশ মহিলা 'চৌরঙ্গী মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতি' (CWDCS) গড়ে তুলেছেন। এই সমিতি 'সুন্দরবন সমবায় দুগ্ধ এবং প্রাণীসম্পদ উৎপাদক ইউনিয়ন' দ্বারা নথিভুক্ত। এরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় Sundarini Naturals নামে এইসব উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে। CWDCS, সুন্দরবনের মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ৭০টি সমবায় সমিতির একটি। এদের দুগ্ধজাত দ্রব্যের মান এতটাই উন্নত যে সম্প্রতি এই পণ্য National Dairy Development

Board দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। দুধ, ঘি, ছাড়াও এই নামে মধু এবং চালও বিক্রি করা হচ্ছে। সুন্দরবনের ৭টি ব্লকের প্রায় ৩৫০০ মহিলা প্রতিদিন ৪০০০ কেজির বেশি দুধ সংগ্রহ করে NDDB-র পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় উৎপাদন, বিপণনের কাজটা করেন। এই মহিলারা নিজেদের বাড়ির অতিরিক্ত দুধ সমবায় সমিতির কাছে বিক্রি করে মাসে প্রায় ৫০০০ টাকা রোজকার করছেন (ঘোষ ২০১৮)। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সুন্দরবনের বেশ কিছু মহিলা আজ স্বনির্ভর।

প্রাণীকুলের অস্তিত্বের বিপন্নতা

সুন্দরবনবাসীরা ভয়কে সঙ্গী করেই অরণ্যে প্রবেশ করে। বাঘ কুমিরের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এই মানুষরা অনেক সময় পালটা আক্রমণে যেতে বাধ্য হয়। মারা যায় বাঘ, কুমির। সরকারি প্রশাসনিক স্তরে এই প্রাণীকুলকে রক্ষা করার নানাবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ঠিকই, তবুও আরো ব্যবস্থার প্রয়োজন। নতুবা এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙে পড়বে। তিল তিল করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে প্রকৃতি। প্রকৃতি এবং অরণ্যচারী জীবের মধ্যে ভারসাম্যই এখন সুন্দরবনকে রক্ষা করতে পারে। সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি অঞ্চলে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যায় জলযানের যাতায়াত, তার থেকে নির্গত তেলের বর্জ্য, জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পরিশ্রুত জল দূরস্ত, সুন্দরবনের নদীনালাকে ঘিরে থাকা শহরাঞ্চলের যাবতীয় বর্জ্য পরিশোধন না হয়েই সরাসরি এই জলে মিশছে। ক্ষতি করছে এই বৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্যের। ক্ষতি করছে অরণ্যবাসী প্রাণীদের খাদ্যের স্বাভাবিক সরবরাহ। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষ এবং অরণ্যবাসী প্রাণীকুলের সংঘাত।

সুন্দরবন এবং পর্যটন

পর্যটন মানচিত্রে সুন্দরবনের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি স্থান থাকার জন্য বিপদটা আরো বেড়ে গেছে। ঘন অরণ্য কেটে হোটেল নির্মাণ, খাঁড়ি অঞ্চলে স্টিমার এবং লঞ্চের অবাধ যাতায়াত, খাঁড়ির জলে বাধাহীনভাবে জঞ্জাল নিক্ষেপ, সব মিলিয়ে পরিবেশ দূষণের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এই ক্ষেত্রে এখনই যদি রাশ টানা না যায় আমাদের ধ্বংসের দিন আর বেশি দূর নেই। এই সংকটটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সুন্দরবনের দরিদ্রতম মানুষেরা সবদিক থেকেই চরম ধ্বংসের শিকার হচ্ছে। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ প্রাথমিক স্তরে বড়ো দুটো কাজ করেছিল। (১) বর্ষার জল ধরে রাখার জন্য হাজার হাজার পুকুর কাটানো এবং (২) পুকুর থেকে নোনা জল বের করে দেওয়া। তবে তার পরবর্তী কাজগুলোর জন্য এই পর্ষদকে সাহায্য করা হয়নি। আসলে সুন্দরবনের নদী বাঁধের সংখ্যা, তার ভাঙনের কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা তথ্যের একটি ভাণ্ডার গড়ে তোলা দরকার ছিল। সেই কাজটাই শুরু করা যায়নি। প্রয়োজন সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে, সুন্দরবনবাসীদের সঙ্গে থেকে বাঁচার এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তাদের জোট বাঁধতে সাহায্য করা। আসলে সুন্দরবনের গ্রামগুলি দ্রুত তার চরিত্র হারিয়ে ফেলছে। জোয়ারে সুন্দরবনের নদীনালা সব ভেসে যাচ্ছে। প্রয়োজন সুন্দরবনের সঙ্গে লড়াইতে না গিয়ে সমস্যার গভীরে পৌঁছে একটা প্রকৃত অরণ্য গড়ে তোলা। তুষার কাঞ্জিলালের বিশ্বাস এটা পারবে একমাত্র সুন্দরবনবাসীরাই। সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে সভ্যতাই বিপন্ন হবে। এর জন্য যে লোকবল বা মানসিকতার প্রয়োজন সেটা সুন্দরবনের মানুষদের জোগাড় করতে হবে। বাদাবন কেটে নদীর চর বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এই বাদাবনকে বাঁচাতে হবে। সঙ্গে পর্যটন সহ নানাবিধ কাজে নৌকা, ভুটভুটি, লঞ্চের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অরণ্যে মধু সংগ্রহ বা বাগদার পোনা সংগ্রহ যেহেতু এই অঞ্চলের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত, সেটা বন্ধ করা যাবে না। সরকার যদি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা হলে সেটা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে।

সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। একটা অরাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করে একমাত্র সুন্দরবনকে বাঁচাবার লক্ষ্য সামনে রেখে একটা সার্বিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কাজটা বলা যত সোজা করা তত কঠিন। তবে এই ধরনের সংগঠন গড়ে না তুললে বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় সুন্দরবনকে বাঁচানো যাবে না। এই দায়িত্ব নিতে হবে সুন্দরবনের যুব সমাজকে। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কোনো বাছ-বিচার করা উচিত হবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের টাস্ক ফোর্স-এর সুপারিশগুলি যাতে দ্রুত রূপায়ণের ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও অর্থবল সুন্দরবনবাসীকেই জোগাড় করতে হবে। অন্য কেউ করে দেবে— এটা ভাবলে সংগঠন জনমুখী হবে না। তার জন্য প্রত্যেকটি পরিবার থেকে অবস্থা বুঝে চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে, সুন্দরবনবাসীকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই জঙ্গলকে টিকিয়ে রাখতে হবে। বাদাবন কেটে সেই চর কাউকে পাট্টা দেওয়া যাবে না। সুন্দরবনের কাঠ বাইরে চালান দেওয়া যাবে না।

নদীবাঁধের উপর নজরদারি বাড়াতে হবে। সেচ দপ্তর এবং তার কন্ট্রাক্টরদের দুর্নীতির ফলে বাঁধের গুণমান বজায় থাকে না। এই কাজে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতে পারাটাই একমাত্র পথ। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে সুন্দরবনে যতটা কাজ করা যেতে পারত তা করা সম্ভব হয়নি।

বাঁধের উপরিভাগ কতটা চওড়া হবে এবং নদী থেকে বাঁধের ঢাল কতটা হবে সেই কাজটার উপর তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখতে

হবে। রিং বাঁধের জন্য সঠিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ও নানা সরকারি দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চেষ্টায় সুন্দরবনবাসীদের এক অংশের আয় কিছুটা বেড়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থার এবং পরিকাঠামোগত উন্নতিও কিছুটা হয়েছে (কাঞ্জিলাল ২০০৯)।

চিংড়ির পোনা সংগ্রহের সময় বাঁধের ঢালে জাল নিয়ে হাঁটাহাঁটির ফলে বাঁধের গোড়ায় একটা প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা না গেলেও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

অন্যান্য সব জায়গার মতো সুন্দরবনবাসীরাও ভোগ পাগল হয়ে উঠেছে। পোশাক পরিচ্ছদে ব্যয়ের হার প্রচুর পরিমাণ বেড়েছে। সুন্দরবনে প্রথম দিকে বিয়েতে লেনদেনের ব্যাপার প্রায় ছিল না বললেই চলে। আজ সেটা ঘড়ি, আংটি, বোতাম, সাইকেলের সীমা পেরিয়ে টিভি, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল ও মূল্যবান আসবাবপত্রে পৌঁছে গেছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-গর্ভবতী মা ও শিশুদের পুষ্টিকর সুষম খাদ্যের জোগান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শেষের কথা

সুন্দরবনের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বিচার করে এবং উল্লিখিত বিভিন্ন গবেষকের বিশ্লেষিত তথ্যগুলি দেখে, মনে হয় এই অরণ্যচারী মানুষদের রক্ষা করা, তাদের জীবন-জীবিকার পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো, প্রকৃতি আর তার প্রাণীদের বাঁচানোর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি সুন্দরবনের অরণ্যের সৌন্দর্য্য, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং কুমির সহ হরিণ এবং সব পশু পাখি রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই প্রকৃতি ধ্বংস হবে। ধ্বংসের মুখে পড়ব আমরাও। আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে এই কঠিন কাজটাই করতে হবে যাতে সুন্দরবনের অরণ্যে নরখাদকের আক্রমণে নিহত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। 'বিধবাদের গ্রাম' বলে কিছু না থাকে। সুন্দরবনের প্রকৃতির মহারাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায়। খাঁড়ির জলে নিরাপদে বেঁচে থাকে কুমির, গাছের ডালে ডালে পাখি, ম্যানগ্রোভের পাড়ে হরিণের দল। তা হলেই সার্বিকভাবে বাঁচব আমরাই, এই মানবজাতি। স্লোগান এখন একটাই হওয়া উচিত 'সুন্দরবন বাঁচাও। বাঁচুক জীববৈচিত্র্য, বাঁচি আমরা'। মানুষ, পশু, প্রকৃতি সব কিছু মিলিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হোক।

তথ্যসূত্র

Ranjan Chakarbarti (2009), 'Local People and the Global Tiger: An Environmental History of the Sundarbans' Global Environment 3, 72-95.

Ranjan Chakarbarti, 'Prioritising the Tiger: A History of Human-Tiger Conflict in the Sundarbans', https://www.currentconservation.org/issues/prioritizing-the-tiger-a-history-of-human-tiger-conflict-in-the-sundarbans/

Sahana Ghosh, 28 December 2018, 'Tiger Windows of Sundarbans: Navigating ecology, beliefs and mental health. https:///india.mongabay.com/2018/12/tiger-windows-of-sundarbans-navigating-ecology-belifs-and-mental-health/

Sahana Ghosh, 5 December 2018, 'Sundarbans women lead the way in making dairy farms organic.' Mongabay Series: Environment and Her. https:///india.mongabay.com/2018/12/sundarbans-women-lead-the-way-in-making-dairy-farms-organic/

Annu Jalais, 2007 Debate 'The Sundarbans:Whose World Heritage Site?". Conservation and Society, Pages 1-8 Volume 5, No. 3.

তুষার কাঞ্জিলাল, (২০০৯), 'সুন্দরবনবাসীর প্রতি শ্রীতুষার কাঞ্জিলালের একটি নিবেদন' টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট।

Amites Mukhopadhya, (2005), 'Negotiating development: the nuclear episode in the Sundarbans of West Bengal.' Anthropology Matters, Vol. 7, No. 1.

Tushar K. Niyogi, April 1996, 'Tiger Cult Of The Sundarvans'. Anthropological Survey of India: Calcutta.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য আমায় উৎসাহ জুগিয়েছেন অসি গুহ। ওঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ শ্রীতপনকুমার মৌলিক মহাশয়ের কাছে। এবং বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক শ্রীঅভিজিৎ গুহ মহাশয়ের কাছে।

পিতৃতর্পণ

শুভনীল চৌধুরী

সচরাচর সাধারণ মানুষ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে স্মৃতিকথা লেখা হয় না। স্মৃতিচারণ করা হয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের। তবু মনে রাখা আবশ্যিক, অসংখ্য সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমেই ইতিহাস রচিত হয়। আমাদের মস্তিষ্ক অসংখ্য সাধারণ মানুষের এই প্রয়াসকে সহজে অনুধাবন করতে পারে না। তাই আমাদের প্রবণতা ইতিহাসের উজ্জ্বল ব্যক্তিদের জীবন, স্মৃতিকথাকেই সাক্ষ্য হিসেবে হাজির করে সময়ের রূপ নির্মাণ করার। এতৎসত্ত্বেও সাধারণ অ-নামা মানুষের জীবন সংগ্রামের মধ্যেই অনেক সময় ইতিহাসের ছবি ধরা পড়ে। আমার বাবা ছিলেন সেরকমই একজন সাধারণ মানুষ। তাঁকে নিয়েই কিছু কথা বহুদিন ধরে বলতে চাইছিলাম। নিজের বাবাকে নিয়ে লেখা কঠিন, ব্যক্তিগত স্মৃতি এমনভাবে ভিড় করে আসে যখন নৈর্ব্যক্তিকভাবে কথাগুলি বলা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই দ্বিধা থেকেই বর্তমান নিবন্ধটি লিখতে দেরি হয়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণসভায় (২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯) পঠিত এই রচনা, *আরেক রকম*-এর সম্পাদকমণ্ডলীর উৎসাহে, কিছু পরিমার্জন করে, অবশেষে পাঠকের সামনে উপস্থিত করলাম। ব্যক্তিগত আবেগ ও স্মৃতির বাহুল্য থাকলে আমাকে ক্ষমা করবেন। এই নিবন্ধ রচনা করার একমাত্র কারণ একটি প্রজন্মের অপরিসীম সংগ্রামের কাহিনিকে আমার বাবার জীবনের কাহিনির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, রাত দশটা ত্রিশ মিনিটে আমাদের বাবা শ্রীপ্রবীর চৌধুরী প্রয়াত হন। দীর্ঘ তিন বছর ফুসফুসের দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে, অবশেষে ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁর লড়াই শেষ হয়।

লড়াই যে শুধুমাত্র এই দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে বাবাকে লড়তে হয়েছিল, তা নয়। দীর্ঘ ছিয়াত্তর বছরের জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে রয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। ১৯৪২ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা শহরে বাবার জন্ম। পিতা চন্দ্রচূড় চৌধুরীর অষ্টম সন্তান, প্রবীর। চন্দ্রচূড় চৌধুরী ছিলেন ঢাকা শহরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। ছিল স্থিতিশীল চাকরি এবং সম্মানজনক জীবন। কিন্তু প্রবীরের পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই দেশ ভাগ। হঠাৎ ছিন্নমূল হয়ে, সমস্ত সম্পত্তি, ভিটেমাটি ছেড়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় আগমন। প্রথমে খিদিরপুরে বাসা নেওয়া, পরে টালিগঞ্জে অবস্থিত উদ্‌বাস্তু কলোনি সূর্যনগরে চলে আসা ১৯৫০ সালে। দেশভাগ আমাদের বাংলার কয়েক লক্ষ পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। চন্দ্রচূড় চৌধুরীর পরিবার তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঢাকার শিক্ষকতার জীবনের পরে কলকাতায় এসে চরম দারিদ্র্য ও অনাহারে দিন কাটাতে হয় চৌধুরী পরিবারকে। চোদ্দ জন সন্তানকে নিয়ে সেই লড়াই লড়তে লড়তে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক ছিল, নানা হাতছানিতে সন্তানরা সাড়া দিয়ে অন্ধকারে চলে যেতে পারত। কিন্তু তারা যায়নি। অদম্য লড়াই, জেদ এবং জীবনীশক্তি নিয়ে প্রবীর চৌধুরী এবং তাঁর ভাই-বোনেরা লড়ে গেছেন সময়ের বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়-বৈষম্য-অনাচারের বিরুদ্ধে। লক্ষ একটাই— যেনতেনপ্রকারেণ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে, দারিদ্র্যের কাছে হার মানা যাবে না।

এই লড়াইয়ে একমাত্র হাতিয়ার শিক্ষা। যেভাবেই হোক শিক্ষা পেতে হবে, শিক্ষার মাধ্যমেই গড়ে নিতে হবে ভবিষ্যৎ। বাবার স্কুলজীবন শুরু খিদিরপুরের সেন্ট টমাস স্কুলে। কিন্তু তাঁরা সূর্যনগরে চলে আসার পরে নেতাজিনগর বিদ্যামন্দিরে ভরতি হয়ে সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বাবা ভরতি হন গড়িয়া দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে যেখান থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন বাবা। কিন্তু কলেজে পড়া অবস্থাতেই তাঁর মায়ের মৃত্যু, সংসারে অনটন, অগত্যা জীবিকার সন্ধানে বেরোতে বাধ্য হলেন তিনি। প্রথম জীবনে চাকরি করেন কোনো কোম্পানিতে। তারপরে নির্মাণ ব্যবসায় নামেন বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে ধাক্কা খেয়ে, আরো নানা জীবিকার চেষ্টা করে, ফিরে আসেন আবার শিক্ষার জগতে। পিতা চন্দ্রচূড় চৌধুরীর ঐতিহ্যকে বহন করে হয়ে ওঠেন শিক্ষক। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি, গৃহশিক্ষকতা করেই সংসার চালিয়েছেন। শুরুর দিকে

সাইকেল চালিয়ে ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াতেন। পরে, নিজের বাড়িতেই শুরু হল ক্লাস। সূর্যনগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী বাবার হাত ধরে গণিত ও বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই আজও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যে প্রবীর চৌধুরীর কাছে নেওয়া তাদের বাল্যবয়সের প্রথম পাঠ তাদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাবা সেই বিরল প্রজাতির মাস্টারমশাইদের মধ্যে পড়বেন যাঁর প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা বহু দশক পরেও অক্ষুণ্ণ আছে। এবং বলতেই হবে যে তিনি শিক্ষক হিসেবে ভাগ্যবান, কারণ তাঁর অন্তিম মুহূর্তেও ডাক্তার হিসেবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরই হাতে তৈরি একজন ছাত্র। একজন শিক্ষক জীবনে আর কীই বা প্রত্যাশা করতে পারেন!

জীবনের ধর্মই এই যে শত অভাব অনটনের মধ্যেও তা শুধুমাত্র জীবনধারণের চিন্তায় অতিবাহিত হতে পারে না। সৌন্দর্য, প্রেম, সংগীত, শিল্প ও যা কিছু মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার দিকে ধাবিত হওয়া এবং তার থেকে রসদ কুড়িয়ে আনা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমাদের বাবা এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। যৌবনে ভালো ফুটবল খেলতেন, ক্রীড়া-প্রেমিক ছিলেন। নিয়মিত খেলা দেখতেন। সদ্য সমাপ্ত ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রায় সব ম্যাচ দেখেছেন। সূর্যনগরের বাসিন্দাদের মনে থাকবে স্পোর্টসের দিন বাবার রেফারিং-এর কথা। সকাল থেকে সন্ধে অবধি মাঠে থেকে পাড়ার স্পোর্টস যাতে সুসম্পন্ন হয় তার তদারকি করতেন। বাড়ির প্রায় সমস্ত কাজ করতে জানতেন। ইলেকট্রিকের কিছু খারাপ হলে বাবাই ঠিক করতেন, আমাদের পাকা বাড়িটাও বাবার তত্ত্বাবধানে তৈরি, ছবি আঁকতে জানতেন, আলপনা দিতে পারতেন, এমনকী রান্নাও জানতেন। সংগীতের প্রতি তাঁর ছিল নিবিড় অনুরাগ। নিজে গিটার বাজাতেন, শেখাতেন। বহু অনুষ্ঠান করেছেন। এই পাড়ায় অনেক অনুষ্ঠানে সংগীত রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন। সংগীতের নিবিড় শ্রোতা ছিলেন। গান শুনে বলে দিতে পারতেন, গানটি গায়ক সুরে গাইছেন কি না, কোন রাগে গানটি তৈরি হয়েছে, ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সরস্বতী পুজোর দিন সংগীতের অনুষ্ঠান হত আমাদের বাড়িতে। আমাদের আত্মীয়স্বজন, ছাত্রছাত্রীরা মিলে বছরের পর বছর এই অনুষ্ঠান করেছেন। এমনকী আমাদের বাড়ির কোনো অনুষ্ঠান হলেও তাতে সংগীত অনিবার্য ছিল। পরবর্তীকালে টিভিতে এবং ইন্টারনেটে সংগীত শুনতেন তিনি। হাসপাতালে ভরতি হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত বাবার সঙ্গী ছিল গান, ভালো মুডে থাকলে গুনগুন করে গাইতেন। নিজের ছোটো ছেলের গানের শখ পূরণ করেছেন, তার সমস্ত সংগীতানুষ্ঠানে দূরদূরান্তে পৌঁছিয়েছেন, ক্রমাগত উৎসাহ দিয়েছেন গান গাওয়ার। গান ছাড়া বাবা থাকতে পারতেন না। রেকর্ড প্লেয়ারে এলপি রেকর্ড থেকে শুরু করে, ক্যাসেট-সিডি হয়ে আমাজন মিউজিক সমস্ত মাধ্যমেই গান শুনেছেন বাবা। প্রযুক্তি এগিয়েছে বাবাও এগিয়ে গেছেন সেই প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়ে গান শুনতে।

শুধু গান শোনা নয়। ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কের কাজ বা বিভিন্ন বিল দেওয়া, আমাজনে জিনিস কেনা, সুইগিতে খাওয়ার অর্ডার, উবের বুক করে বেড়াতে যাওয়া, সমস্ত কাজ করতে জানতেন। আমাদের বয়সি অনেকেই এখনও এই সমস্ত প্রযুক্তি নিয়ে খুব বেশি সড়গড় নয়। কিন্তু বাবার কাছে এই সব জলভাত ছিল। ফেসটাইমে ছেলে এবং নাতনির সঙ্গে আড্ডা, নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপে কথোপকথন, নেটপ্লিক্সে সিনেমা দেখা, সবই করেছেন। প্রযুক্তিগতভাবে আধুনিক ছিলেন, তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছেন সহজেই।

অবশ্য শুধু প্রযুক্তিগতভাবে নয়। মানসিকভাবেও আধুনিক ছিলেন বাবা। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমার মায়ের সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে বিবাহ করেছেন। বাবা-মা ঝগড়া করছেন এমন দৃশ্য আমাদের মনে পড়ে না। মায়ের ওষুধ খাওয়া, মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকতেন, মায়ের যাতে অসুবিধা না হয় শেষ দিন অবধি সেই কথা ভেবেছেন। অন্যদিকে, তাঁর তিন ছেলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধের জুড়ি মেলা ভার। ছেলেদের মতামতকে মূল্য দিতেন। আমাদের মনে পড়ে না বাবা জোর করে আমাদের উপর কিছু চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা পড়াশোনার জন্য প্রত্যেকেই অল্প বয়সে কলকাতার বাইরে গিয়েছি। তখন আর্থিকভাবে আমরা স্বচ্ছল ছিলাম না। কিন্তু বাবা সেসব ভাবেননি। বাবা সমস্ত খরচ জোগাড় করেছেন, হাসিমুখে। আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি, বাবা মানা করেননি। ছোটোভাই গান গেয়েছে, ক্রিকেট খেলেছে, বাবা টাকার কথা ভাবেননি, উৎসাহ দিয়েছেন, সাজসরঞ্জাম কিনে দিয়েছেন। আবার আমাদের যথাসময়ে শাসন করেছেন, ঠিক-বেঠিকের তারতম্য বুঝিয়েছেন এবং আমাদের পড়াশোনায় যাতে কোনো খামতি না থাকে তার চেষ্টা করে গেছেন। আমরা তিন ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছি, আমাদের ছোটো ভাই আইআইটি কানপুর থেকে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করেছে। এইসবই আমরা করতে পেরেছি আমাদের বাবার জন্য।

তবে, বাবার দায়িত্ববোধ তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর ভাই-বোনদের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ। কেউ অসুস্থ হলে বা হাসপাতালে ভরতি হলে বাবা

অবশ্যই সেখানে যেতেন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা, ডাক্তারের কাছে দেখাতে নিয়ে যাওয়া সবই বাবা করতেন যতদিন সুস্থ ছিলেন। আবার বাড়িতে সবার খোঁজখবর নিতেন, কাকাদের সুখেদুঃখে সবসময় পাশে থাকতেন বাবা। আমি এবং আমার স্ত্রী সন্তান ছাড়া দুনিয়ায় কার কী হল না হল এই নিয়ে আমার মাথাব্যথা হওয়ার কিছু নেই। এই যে সংকীর্ণতাবোধ এবং আত্মকেন্দ্রিকতা আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে দেখতে পাই, বাবা তার ব্যতিক্রম ছিলেন। সমষ্টির ভালো হলে তবেই আমার ভালো হবে, আমার একার ভালো হলেও সমষ্টি পিছিয়ে থাকলে সেই ভালো হওয়া অর্থহীন— এই জীবনবোধ বাবা নিরন্তর নিজের মধ্যে লালন করেছেন এবং তাঁর সন্তানদের দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আসলে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াই সমষ্টিগত। আপনি যখন মৃত তখন আপনি সবথেকে বেশি একা। বাবা যখন অসুস্থ, হাসপাতালে শয্যাশায়ী, আমরা তাঁর পাশে থাকলেও, তাঁর যন্ত্রণার মধ্যে, ধীরে ধীরে প্রাণ যখন মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্য দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি সম্পূর্ণ একা। কিন্তু যখন তিনি বেঁচে, তখন সমষ্টিগত প্রচেষ্টাতে জীবিত। যে ডাক্তারবাবুরা বাবার চিকিৎসা করেছেন, যে নার্সরা বাবার সেবা করেছেন, যাঁরা বাবার অক্সিজেন সরবরাহ করতেন, যাঁরা বাবাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে পরম যত্নে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন, বা যিনি পিজি হাসপাতালে রাত জেগে বাবার দেখভাল করতেন, সবার সমষ্টিগত প্রচেষ্টাতেই শেষ ক'টা বছর জীবিত ছিলেন বাবা, যেমন আমরাও জীবিত আছি সমষ্টিতে। ডাক্তারবাবুরা এবং বাকি সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা বাবার সেবা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের পরিবারের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি বাবার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভদ্র এবং পরিমার্জিত। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকলেও ডাক্তার আসলে বাবা হাত জোড় করে নমস্কার করতেন, এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি। আবার নার্স এবং অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গেও সুব্যবহার করতেন। আসলে, তাঁর মধ্যে এক প্রগাঢ় শিষ্টাচার ছিল, যার ব্যতিক্রম অতি অসুস্থতার সময়েও হয়নি।

একটু নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে বোঝা যায় বাবাদের প্রজন্মের মানুষদের সাফল্য। ছিন্নমূল হয়ে চলে আসতে হয়েছিল ভিটে মাটি ছেড়ে। ঢাকার প্রতিষ্ঠিত জীবন তছনছ করে দিয়েছে দেশভাগ, আর্থিক উন্নতির জায়গায় চরম আর্থিক অবনতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সব হারিয়ে, সব ছেড়ে ভিনদেশে এসে গড়ে তুলতে হয়েছে জীবন। আজকে আমাদের পাড়া উন্নত হয়েছে, এলাকা উন্নত হয়েছে, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, বিদেশ যাচ্ছে। কিন্তু সত্তর বছর আগে যাঁরা এই অঞ্চলে এসে বসতি বানিয়েছিলেন তাঁরাই এই উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম অদম্য জেদ, ইচ্ছাশক্তি এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করে। গোটা একটি প্রজন্ম গভীর অতলান্ত অন্ধকার গর্ত থেকে ওঠার চেষ্টা করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে, আমরা সেই গর্ত থেকে মুখ তুলে সূর্যের আলো দেখছি, কারণ আমাদের পিতা-মাতারা জীবনপণ করে সেই গর্ত থেকে ক্রমাগত বেরোনোর চেষ্টা করে গেছেন। আজ যখন বাবা আর আমাদের মধ্যে নেই, আমরা প্রণাম জানাই এই লড়াইকে, এই জীবনীশক্তিকে, যা শুধু আমাদের বাবা নয় ছিল তাঁর প্রজন্মের সমস্ত মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে যাঁরা এই অঞ্চলের অধিবাসী। বাবার স্মৃতি সদা আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকবে আর আমাদের অনুপ্রেরণা দেবে তাঁর লড়াই, জীবনবোধ এবং জীবনীশক্তি।

আজ বাবার প্রজন্মের মানুষেরা একে একে চলে যাচ্ছেন তাঁদের জীবনের অপরিসীম লড়াইয়ের উত্তরাধিকার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে। দেশভাগের প্রবল যন্ত্রণা বহন করে বেড়িয়েছেন এঁরা। কিন্তু কোনোদিন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাত ধরেননি, ভেদাভেদের বিষ ছড়াননি সন্তানদের মধ্যে। চেয়েছিলেন যাতে তাঁদের সন্তানরা এক উন্নত ভারতে বসবাস করতে পারে যেখানে তারা নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আজ যাঁরা দেশের মসনদে বসে, তাঁরা আবার নতুন করে দেশভাগের যন্ত্রণা উশকে দিচ্ছেন, ভেদাভেদের রাজনীতির মাধ্যমে দেশকে রসাতলের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। বাবাদের প্রজন্মের লড়াই আমাদের আলোকবর্তিকার মতন কাজ করুক। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ না ভুলে যাই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একটি সুস্থ সমাজ ও দেশ উত্তরাধিকারে দিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। বাবার প্রজন্মের লড়াইয়ের ব্যাটন এখন আমাদের হাতে। বাবা-রা একটি ক্ষতবিক্ষত দেশ হাতে পেয়েছিলেন এবং তাকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত স্তরে নিরন্তর লড়াই চালিয়েছেন। সেই দেশকে বাঁচিয়ে তাকে আরো উন্নত করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতাকে পরাভূত করা সেই নতুন দেশ গড়ার প্রথম ধাপ। এই সংকল্পই হোক আমাদের পিতৃতর্পণ।

অক্ষয়বটের দেশ

বঙ্কিমচন্দ্র: অসমাপ্ত পুনঃপাঠ

কালীকৃষ্ণ গুহ

নারীদেহের শোভার জন্যই পুষ্প-সৃজন হইয়াছিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা কথাসাহিত্য আজকাল খুব বেশি পড়া হয় না। বাংলাভাষায় প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে জানি। সেইসব লেখার পাশে, গল্প উপন্যাসের পাশে (কবিতার পাশেও)— শুয়ে-বসে দিন কাটাই। দূরত্ব রচিত হয়। বার্ধক্যের কবলে ক্রমশ নিজেকে সমর্পণ করতে যাচ্ছি, বুঝতে পারি। আশা করি এই অক্ষমতা মার্জনাযোগ্য।

কিছুদিন আগে চার খণ্ডে বাংলায় অরুণ সোম-অণূদিত *যুদ্ধ ও শান্তি* পড়ে এক অভিভূত অবস্থায় সময় কাটিয়ে এসেছি। সে কথা কিছু লিখেছি। তারপর বিরতি নিয়েছি। কিন্তু দীর্ঘদিন বিরতি নেয়ার সময়ও আর হাতে নেই। সম্প্রতি দু-একটা গল্প-উপন্যাস পড়ার পর হাতে উঠে এল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমগ্র। পর পর পড়ে যেতে হল অনিবার্য একটা আকর্ষণ থেকে, মোহগ্রস্তের মতো, *দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী বিষবৃক্ষ ইন্দিরা রাজসিংহ দেবীচৌধুরানী*। সবই পুনঃপাঠ। কেমন লাগে দেখা যাক— এই মনোভাব নিয়ে শুরু করেছিলাম। এই পর্যন্ত পড়ে মনে হল এবার বিরতি নিতে হবে। মনে হল, এই বিরতিতে কিছু কথা লিখে রাখা যাক, যদিও শতাধিক বছর ধরে এই মহালেখকের কথা গবেষকরা অধ্যাপকরা সাহিত্যসাধকরা লিখে গেছেন। তবু ভিন্ন ভিন্ন মন থেকে ভিন্ন ভিন্ন কথা কিছু উঠে আসবেই। তাই এই লিখন। তরুণ বঙ্কিম কত বিস্তৃত বিশ্বসাহিত্য পাঠ সমাপ্ত করে এদেশের সংস্কৃত সাহিত্য আত্মস্থ করে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন তা বোঝা যায় *কপালকুণ্ডলা*-র পরিচ্ছদগুলিতে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ করলে! কালিদাস শেকসপিয়র জয়দেব বিদ্যাপতি ভবভূতি মধুসূদন প্রমুখ ছিল তাঁর একান্ত অধিকারে। সেই সঙ্গে ছিল ইতিহাসের জ্ঞানের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি।

বঙ্কিমের আবির্ভাবকাল কীরকম ছিল তা তরুণ রবীন্দ্রনাথের কথায় বুঝে নিতে পারি, 'যেকালে বঙ্কিমের নবীন প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলা দেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মানে আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।... পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই-সব বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।' রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি সর্বজনপঠিত হলেও এখানে আমরা আরেকবার পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম বর্তমান নিবন্ধের অমোঘ পূর্বলেখ হিসেবে।

২

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন এক অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদ মালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তপ্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।' *দুর্গেশনন্দিনীর* শুরুর এই স্তবকটিকে বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম স্তবক। সাহিত্য-সম্রাটের হাতে স্থাপিত হল বাংলা কথাসাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে এল যতিচিহ্নগুলি— কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি। ভাষা তার সৌন্দর্য ও সারবত্তা নিয়ে বিকশিত হল। সরলজটিলের মিশ্রণ ঘটল। যতিচিহ্নগুলি এল অবশ্যই ইংরেজিভাষা থেকে— বাক্যনির্মাণও এল সেই

ইংরেজিভাষার অনুসরণে আমাদের সেই আলোকপ্রাপ্তির যুগে। মাইকেলের পর বঙ্কিম কাব্যরচনার ও কথাসাহিত্যের নতুন সরণি তৈরি করে দিলেন। কাব্যসাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্বের ইতিহাস যথেষ্টই দীর্ঘ— চর্যাপদের যুগ থেকে যার ক্রমসম্প্রসারণ— কিন্তু কথাসাহিত্য বা গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত শুরু বঙ্কিমের হাতে। এটা নতুন করে বলার মতো কোনো কথা না-হলেও বলে নিতে হবে।

কথাসাহিত্যেরও যে প্রকৃত শক্তি কবিত্বে— শুধু কাহিনি উত্থাপনে বা শুধু ঘটনার বিবরণ তৈরি করায় নয়— তা বোঝা গেল। গদ্যে কেন কাব্য রচনা করা যাবে না, এই প্রশ্ন বঙ্কিমই প্রথমে তোলেন। এবং তিনি তা করে দেখালেন। উদ্ধৃত স্তবকটিকে আমরা একটি কবিতার স্তবক হিসেবেও ভাবতে পারি। মানুষের সৌন্দর্য যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে! মানবমন মিলিত হচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে, সূর্যাস্তে, বিদ্যুদ্দীপ্তিতে, প্রকৃতির দৈনন্দিনের ব্যতিক্রমী এক আকস্মিকে। আকাশ সূর্যাস্ত প্রদোষকাল মেঘ ঝড়বৃষ্টি— সবই এক অর্থে দৈনন্দিনের চেনা জিনিস, এক অর্থে অলৌকিক। এই অলৌকিকতা বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েও যেন মানবচেতনার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। সেই অর্থে অলৌকিক।

৩

ভাবতে হয়, বঙ্কিমের কথাসাহিত্যে কী সেই শক্তি যা আজও আমাদের অভিভূত করে। বিপুল সেই শক্তি নিহিত আছে তাঁর সৌন্দর্যচেতনায়, রূপবোধে, ইতিহাসচেতনায়, মানবমনের বিচিত্র ও গভীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে। মনে পড়বে, বঙ্কিম বলেছিলেন, 'যশের জন্য লিখিবে না।' তাঁর মতে, লেখার কারণ হতে পারে সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং/অথবা সমাজের মঙ্গলসাধন।

তাঁর সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় প্রথমত নারীর রূপবর্ণনায়। তিলোত্তমার রূপ, আয়েষার রূপ, চঞ্চলকুমারীর রূপ, কুন্দনন্দিনীর রূপ, সূর্যমুখীর রূপ আমরা বিস্মিত হয়ে দেখে যেতে থাকি। তসবিরওয়ালি বৃদ্ধা চঞ্চলকুমারীর রূপ দেখে কী করল? 'বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে— এ প্রণাম সৌন্দর্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।' সৌন্দর্যের প্রতি এই 'সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত', আমরা জানি, বঙ্কিমের নিজের! তিলোত্তমার রূপ কেমন? বঙ্কিম তা নিয়ে যথেষ্ট দীর্ঘ বিবরণ লিখেছেন, যাতে ঠিকমতো বোঝানো যায়। এই:

> তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগলভবয়সী রমণীগণের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি প্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদী-দীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক;.... তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত, তাহাতে বিদ্যুদামস্ফুরণ-চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ উষাকালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ। সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না। তিলোত্তমা অপাঙ্গে অর্ধদৃষ্টি করিতে জানিতেন না; দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে; তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুখানি পড়িয়া যাইত, তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না।

শুধু বাইরের রূপ নয়, ভিতরের রূপকেও পাশাপাশি স্থাপন করার জন্য বঙ্কিম এতটা পরিসর নিলেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম নায়িকা চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা পেল। মহাভারতে দ্রৌপদীর রূপবর্ণনার কথা কারো মনে পড়তে পারে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চত্রিংশদবর্ষীয়া বিমলার প্রসঙ্গে বঙ্কিম কী বলেন তাও দেখা যেতে পারে, 'বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে। যার রূপ নাই সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী।' তরুণ বঙ্কিমের এই বিপুল রূপতৃষ্ণা কি বয়সোচিত বিভ্রম? এই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু, আমরা জানি, রূপতৃষ্ণা একটি চিরকালীন জিনিস— সৌন্দর্যচেতনার মৌলিক উপাদান।

তিলোত্তমা রাজপুতকন্যা। তার পাশে পাঠানকুমারী আয়েষার রূপ কেমন— যে বন্দি রাজপুত পুরুষ জগৎসিংহকে দেখে বলেছিল এই বন্দি আমার প্রাণেশ্বর? 'আয়েষার সৌন্দর্য নবরবিকরফুল্ল জল-নলিনীর ন্যায়; সুবিকশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক, কোমল অথচ প্রোজ্বল; পূর্ণদলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।' এই দুই রমণীর রূপের তুলনাও করেছেন বঙ্কিম যেহেতু দুজনই জগৎসিংহের কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন।

বঙ্কিমের রূপতৃষ্ণা— যা নারীর অর্থাৎ তাঁর নায়িকাদের রূপবর্ণনায় উচ্চারিত হয়েছে— যে কত গভীর তা নিয়েই দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ রচনা সম্ভব। তাঁর কবিত্ব ও সৌন্দর্যচেতনা নিয়েও দীর্ঘতর একটি প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। কিন্তু আপাতত আমরা চাইব তাঁর ইতিহাসচেতনার সূত্র ধরে মোগলসাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে। আমাদের ইতিহাসের জ্ঞান অতি ক্ষীণ। আমরা মোগল সম্রাটদের অন্তঃপুরে কিছুটা প্রবেশ করতে পেরেছি— যদি তা

অংশতও ইতিহাসসিদ্ধ হয়— *রাজসিংহ* উপন্যাসটি অবলম্বন করে। প্রথমে আমরা দিল্লি শহরের পরিচয় নিতে পারি। এই:

> জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত-পুলিন-মধ্যবাহিনী নীল-সলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণপ্রধানা মহানগরী দিল্লি প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে— সহস্র সহস্র মর্মরাদি প্রস্তরনির্মিত মিনার, গুম্বুজ, বুরুজ ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে, অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল। নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে, রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা, বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্প-বিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিক জনপরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর-গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সংগীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরিগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কারশিঞ্জিত— এই সমস্ত একত্রিত হইয়া নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতরগোলাপের ছড়াছড়ি, নর্তকীর নূপুরনিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা কমনীয় কামিনী-করতল-কলিত তালের চট-চটা, মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্নি-প্রবাহ, খিচুড়ি পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর চতুর— চতুর্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি; হস্তীর গলঘন্টার ধ্বনি, এক্কার ঝন্‌ঝনি— শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি।
>
> নগরের মধ্যে বড় গুলজার চাঁদনি চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান, তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে, গাহিতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে; প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা 'জ্যোতিষী' দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্বিদগণের যেরূপ আদর ছিল, এমন বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে তাহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদশাহেরা জ্যোতিষশাস্ত্রের অতিশয় বশীভূত ছিলেন, তাহাদিগের গণনা না জানিয়া অনেক সময় অতি গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে, ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকবর রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল। কিন্তু জ্যোতির্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকবর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।
>
> দিল্লীর চাঁদনী চৌকে, জ্যোতিষীগণ রাজপথে আসন পাতিয়া পুঁথি পাঁজি লইয়া মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। শত শত স্ত্রী-পুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গনাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে, পরদানশীন বিবিরাও মুড়িসুড়ি দিয়া যাইতে সঙ্কোচ করে নাই। একজন জ্যোতিষীর আসনের চারিপাশে বড় জনতা।

এই বর্ণনায় সেকালের দিল্লি নগরী আমাদের চোখের সামনে স্থায়ী চিত্ররূপ নিয়ে উপস্থাপিত থাকে। এবং সেই সঙ্গে, জনজীবনেরও কিছু পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। যেন ইতিহাস আমাদের সঙ্গে কথা বলে বঙ্কিমের লেখায়, যখন তিনি *দুর্গেশনন্দিনী রাজসিংহ* বা *দেবীচৌধুরানী*-র মতো উপন্যাস লেখেন। জানি না, ঐতিহাসিকরা বঙ্কিমের জানা বা উপস্থাপিত ইতিহাসকে কতখানি গ্রহণ করেছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীর অবস্থান অমোঘ এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রক। চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেবের ছবি কিনে পা দিয়ে মাড়িয়েছিল বলে— সেই খবর তসবিরওয়ালি বাদশাহর অন্দরমহলে গিয়ে 'বিক্রি' করার ফলে— রাজপুতদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘকালীন যুদ্ধ ঘটে। এবং সেই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব তিনবার পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে রক্ষা করে আর শেষে তাকে বিবাহ করে। এই কাহিনির ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি নিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে, তবে একে অনৈতিহাসিক বলে বাতিল করা যাবে না। নারীশক্তির উপর বঙ্কিমের ছিল অগাধ আস্থা। তিনি মোগল অন্দরমহলের যে চিত্র এঁকেছেন তা যদি আমরা অনুধাবন করি তা হলে বিস্মিত হতে হবে নারীদের প্রাধান্যের পরিচয় পেয়ে। তাঁর ভাষাতেই এই চিত্রটি আমরা দেখে নিতে চাইব। তিনি লিখছেন:

> ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা ক্যাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগল-সম্রাট্‌দিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশনরা। জাঁহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য করিতেন না;

তাঁহার পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া কার্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্ট ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেইসকল লোকের মধ্যে য়ুরোপীয় পর্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।

রৌশন্বারা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশন্বারা তাঁহার প্রধান সহায়, ঔরঙ্গজেবও রৌশন্বারার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশন্বারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্তু রৌশন্বারার দূরদৃষ্টক্রমে তাঁহার একজন মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিনি কন্যা। কনিষ্ঠা দুইটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃষ্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসি ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশন্বারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন, জেব-উন্নিসা তাঁহার পদমর্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।

পদমর্যাদার কথা বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য আছে। বাদশাহের অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অন্ততঃ করিবার নিয়ম ছিল না। অন্তঃপুরে পাহারার কাজের জন্য একটা স্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল। যেমন হিন্দুরাজগণ যবনীগণকে প্রতিহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল বাদশাহেরাও তাই করিতেন। তাতার জাতীয়া সুন্দরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্যের একজন নায়িকা ছিলেন; তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চপদ বলিয়া গণ্য, এবং বেতন ও সম্মান তদনুযায়ী। এই পদে রৌশন্বারা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজান্তঃপুরে সর্ববিষয়ে কর্ত্রী হইতেন। সুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্‌মহালের সর্বকর্ত্রী ছিলেন।

উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হল। কিন্তু মোগল অন্দরমহলের চিত্রটি অন্যভাবে পরিষ্কার করে তুলে ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। এখানে একটি বাক্য বিশেষভাবে লক্ষ করার। তা হল, 'তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়ার ফলেই রৌশন্বারা অন্তর্হিত হয়েছিলেন— অর্থাৎ তাঁকে গোপনে হত্যা করে কবর দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল শাস্তিদানের একটি পদ্ধতি। অন্য তিনটি পদ্ধতি ছিল শিরোচ্ছেদ, শূলে চড়ানো এবং বিষাক্ত সাপের কামড়ে মেরে ফেলা। বাদশাহের অন্দরমহলের দৃশ্যটির অন্য একটি দিকও আমরা দেখে নিতে পারি সাহিত্যসম্রাটের ভাষায়:

> দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর অল্প ভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপ-রাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্‌মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য— চন্দ্র-সূর্য তথায় প্রবেশ করেন না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। তথায় গৃহসকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমত রত্ন-খচিত, ধবলপ্রস্তর-নির্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই— এমন নন্দনকাননিন্দিনী উদ্যানমালা আর কোথাও নাই; এমন উর্বশী মেনকা-রম্ভার গর্ব খর্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই; এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ কোথাও নাই।

এই ভোগবিলাসের ব্যবস্থার মধ্যে পাপ মুক্তি পায়। এই পরিচ্ছেদের নাম *নন্দনে নরক*। অবিবাহিতা মোগল রমণীদের ছিল গোপন প্রেমিক, যেমন জের-উন্নিসার মবারক।

বঙ্কিমের চোখে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র কেমন ছিল তা-ও একবার দেখে নিতে পারি। তিনি লিখছেন, 'ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজিয়া ছিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তাহার স্থানে মুসলমানদের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবের মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্যকীর্তি ছিল, চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।' বঙ্কিমের এই বিবরণে কিছু অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। তবে ভ্রাতৃঘাতী ক্ষমতালোভী ঔরঙ্গজেব যা করেছিলেন তা ধর্মান্ধ উগ্রবাদী শাসকের পক্ষে করা অসম্ভব যে ছিল না তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। এর পক্ষে ঐতিহাসিকদের বিবরণও অনেকটা মিলে যায়।

আজ ভারতবর্ষের শাসকদলের যে ধর্মীয় উগ্রতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাও প্রায় একই রকম ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা হয়। মনে রাখতে হবে, *রাজসিংহ* উপন্যাসের শেষে বঙ্কিম একটি *উপসংহার* যোগ করেছেন 'গ্রন্থকারের নিবেদন' শিরোনামে। তিনি লিখেছেন, 'কোন পাঠক যেন না মনে করেন যে হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এক শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল তখন রাজকীয় গুণে সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল'। একজন বিবেকবান লেখকের একান্ত জরুরি ছিল এই বিচার, যা স্বীকারোক্তির মতো পবিত্র।

৪

সাহিত্যে আমরা কী পড়ি? এই প্রশ্ন বারবার ওঠে। ভাষা পড়ি না মন পড়ি? এর উত্তর বোধ করি একটাই— ভাষা পড়ি মনে পৌঁছনোর জন্য। অর্থাৎ, মন পড়ি। কার মন? লেখকের মন। লেখকসৃষ্ট চরিত্রদের মনও আসলে লেখকের মন। লেখক সর্বজ্ঞ। সর্বত্রগামী। আমরা বলতে চাইছিলাম, কথাসাহিত্য দাঁড়ায় মানবসম্পর্কের কাঠামোর উপর। এই কাঠামোর শক্তিই সাহিত্যের শক্তি। বঙ্কিমের চরিত্ররা— বিশেষত নারীচরিত্রগুলি— অসাধারণ নির্মাণ। একজন সূর্যমুখীকে পৃথিবীর কটা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে ভাবি। গৃহত্যাগ করার পর সূর্যমুখী কমলমণিকে যে চিঠি লিখেছিল তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়েই আমরা এই পাঠপ্রতিক্রিয়া অসমাপ্ত রাখব। সূর্যমুখী লিখছে,

> আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না— কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম— আবার ছিঁড়িলাম— আবার ছিঁড়িলাম— কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভালো বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না।... তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি।

'বিষবৃক্ষ কি?' এই প্রশ্ন তুলে শেষ পর্যন্ত লেখক যে দার্শনিক অবস্থান নেন তাকে আমাদের একজন মহান শিক্ষকের বাক্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়, 'অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে একসময় কিছু বিরূপ কথা শুনেছি। বলেওছি। আজ মনে হয় সকল কূটকচাল পিছনে পড়ে থাকবে। জেগে থাকবেন সময়ের সমান্তরালে একজন মহালেখক।

চিঠির বাক্সো

আরেক রকম ১-১৫ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'বিদ্যাসাগরের আয়নায় বাঙালি' প্রবন্ধটি নিয়ে পরবর্তী সংখ্যায় পত্রলেখক শ্রীবিপ্লব আচার্য কিছু সপ্রশংস উক্তি করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস ও ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের যে বিষয়টি তিনি উত্থাপন করেছেন সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমি এ ব্যাপারে যেটুকু বুঝি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি।

আসলে একজন ব্যক্তির অস্তিত্বের তিনটি স্তর থাকে— ব্যক্তিক, সামাজিক, সর্বজনীন। অবশ্য এরা একই আধারে মিলেমিশেই থাকে। ইতিহাসের আওতায় থাকে মধ্যিখানের স্তরটুকু। এই স্তরেই আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি। প্রথাগত ইতিহাসচর্চাও এই স্তরটি নিয়েই। কিন্তু এটাই জীবনের সব নয়। ব্যক্তিকে আরো মূলগতভাবে বোঝা দরকার। ইতিহাস সেটা খুব একটা না পারলেও সাহিত্য খানিকটা পারে। মহৎ সাহিত্য সামাজিক স্তরে জন্ম নিয়েও সেই স্তরটা ছাপিয়ে ব্যক্তিকে মিলিয়ে দেখে সর্বজনীনের সঙ্গে, তাই তা সর্বকালে সমকালীন। এইভাবেই সাহিত্য আমাদের হৃদয়বত্তার দীক্ষা দেয়। সর্বজনীন মানবতার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা বাস্তবেও কিন্তু ব্যক্তিমানুষের, বলা যায় মানব অস্তিত্বের, একটা জরুরি তাগিদ। এর আন্দাজ দিয়েছিল পশ্চিমি মার্কসবাদের 'radical need'-এর তত্ত্ব, যা মার্কসের 'species being'-এর ধারণা থেকে উদ্ভূত। এই ব্যাপারটা কিন্তু মানবচরিত্রকে বেশ স্ববিরোধী ও জটিল করে তুলতে পারে। তাই এমনটা হতেই পারে যে, যে-লোক হিন্দুরাষ্ট্রের জিগির তুলে মুসলমানদের দেশ থেকে তাড়াতে চাইছে সেই আবার একটি মুসলিম ছেলের বিপন্ন মুখ দেখে কষ্ট পাচ্ছে, তাকে আশ্রয় দিচ্ছে। প্রথম কাজটি তার সামাজিক সত্তার প্রকাশ, দ্বিতীয় কাজটি সমাজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তিকে মেলানো সর্বজনীন মানবতার সঙ্গে।

এখন কথা হল, এই ব্যক্তি ব্যাপারটা কী? উত্তরের জন্য বিজ্ঞান, আরো নির্দিষ্ট ভাবে বললে স্নায়বিক বিজ্ঞানের দিকে তাকানো যেতে পারে। ইদানীং সাহিত্যের মতো বিজ্ঞানও ব্যক্তিমানুষকে মিলিয়ে দেখছে সর্বজনীন মানবসত্তার সঙ্গে। ব্যক্তি হল শরীরস্থ মস্তিষ্ক আর স্নায়বিক রসায়ন, যা লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে উঠেছে। মানবপ্রকৃতি তাতেই নিহিত। সেখানেই আছে ভালোবাসা, পারস্পরিকতা, আত্মত্যাগ; সেখানেই আছে লোভ, প্রতিযোগিতা, ঘৃণা, হিংস্রতা। মানবপ্রকৃতি এক অর্থে সর্বজনীন; তার বিশেষ জেনোটাইপ, ফেনোটাইপ কিছু নেই। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে অবশ্য প্রচুর পার্থক্য হতে পারে (গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে নয় কিন্তু)। সংস্কৃতি যেমন শরীরে প্রথিত, তেমনই আবার মানুষের জৈবিকতা তৈরি হয় অনেকটা সমাজ ও তার সংস্কৃতি দিয়েই, এটাও বিজ্ঞান আমাদের জোর দিয়ে বলছে। বিজ্ঞান শরীরের গভীর রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে জৈবিকতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বোঝাবার চেষ্টা করছে আমাদের। এমনকী যাকে আমাদের স্বভাবের স্বয়ংক্রিয় পূর্বপ্রবণতা (automated predisposition) বলা হয়, সেও শরীর আর সংস্কৃতির বিবর্তনের সন্ধিস্থলে নির্মিত। ব্যক্তি ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বুঝতে হলে জৈবিকতা ও সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটাই আমাদের শেষপর্যন্ত বুঝতে হবে। তাই নির্মম একটা সংস্কৃতির মধ্যে জন্মে ও বড়ো হয়েও (যেমন ধরা যাক, বিধবাদের যারপরনাই কষ্ট দেওয়ার সংস্কৃতি) কোনো ব্যক্তির বিধবাদের জন্য প্রাণ কাঁদতে পারে, অন্য অনেকের চেয়ে এত তীব্রভাবে কাঁদতে পারে যে তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। এই উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি যে সমাজ-সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারবেন

তা হয়তো নয়। ভেতরে-বাইরে সংস্কৃতির চাপ তাঁর ওপর অল্পবিস্তর থাকবেই।

বিজ্ঞান অবশ্য teleology (পরমোদ্দেশ্যবাদ)-ভিত্তিক কোনো মানবপ্রগতির সমাধান বাতলাচ্ছে না। মানুষকেই ঠিক করতে হবে সে সামূহিকভাবে ভালোবাসা-পারস্পরিকতার চর্চা করবে, নাকি উলটোটা। স্বর্গ-নরক, সুর-অসুর দুটোই তো তার মধ্যে আছে। প্রথমটার চর্চা করতে হলে, স্নায়ুবিজ্ঞানী Antonio Damasio-র ভাষায়, তার 'special civilizational efforts' লাগবে। সেই প্রয়াস সে যদি এখনও না করে উঠতে পারে, তবে অবশ্য তার সভ্যতার সমূহ বিপদ। সভ্যতার সমস্যাগুলোকে বোঝা ও তাদের মোকাবিলার জন্য আমাদের বড়ো করে ভাবতেই হবে, চিন্তার ধাঁচা বদলাতেই হবে। আমার অধীতব্য বিষয় ইতিহাসেও Daniel Lord Smail-এর মতো কেউ কেউ স্নায়বিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে neuro-history-র চর্চা শুরু করেছেন। তাতে ইতিহাসের সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা আর সর্বজনীন চরিত্র দুটোই বুঝতে সুবিধে হচ্ছে। এই ইতিহাসচর্চা সময়ের দিক থেকে এক গভীর অতীতে অবগাহন করে, এবং মানুষের সংকটাপন্ন ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্‌বেগের সঙ্গে জড়িতও বটে। বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু লেখালিখি করেছি। এখানে খুব সংক্ষেপে বলতে গিয়ে বোধহয় ভালো করে বোঝাতে পারলাম না। পরে সময়সুযোগমতো *আরেক রকম*-এর পাতাতেই এ নিয়ে লেখার ইচ্ছে রইল।

অনুরাধা রায়
কলকাতা

পুনঃপাঠ

চলচ্চিত্রে সমকালীনতা

মৃণাল সেন

চলচ্চিত্রে সমকালীনতা বা Contemporaneity নির্ধারিত হবে কীভাবে? টাটকা কোনও অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছবি তুললেই কি তাকে সমকালীন বলা হবে? না, ব্যবহার্য উপাদানের প্রতি চিত্র-নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমকালীনতা নির্ণীত হবে?

চলচ্চিত্রানুরাগীদের অনেকেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করে ফেলেন অতি সহজেই, ট্রাম-বাস-হাল মডেলের মোটরগাড়ি ও মাথার ওপর বিদ্যুৎ-চালিত পাখা থাকলেই তা একালের, আর পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল ও মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন ঝুললেই তা সেকেলে। মোটামুটি এই সাদাসিধে ধারণা নিয়েই অনেকে একাল আর সেকালের তফাতটা বুঝে নেন। কিন্তু বিষয়টা অত সহজ না।

একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না এমন একটা ঘটনা এখানে তুলে ধরা যাক:

অ্যান্ড্রোক্লিস ও সিংহের গল্প আজকের নয়, অজানাও নয়। গল্পটি প্রাচীন ও অতিপরিচিত। সেই গল্প নিয়ে বার্নার্ড শ একটা নাটক লিখলেন, নাম 'Androcles and the Lion'. নাটকটি যখন জার্মানির কোথাও মঞ্চস্থ হয়— খুব সম্ভবত বার্লিনেই— তখন এক ডাকসাইটে রাজপুরুষ অভিনয় দেখতে দেখতে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে নাটক শেষ হওয়ার আগেই একসময়ে তিনি হল থেকে বেরিয়ে যান। শ শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'যাক, ভদ্রলোক তাহলে আমাকে বুঝতে পেরেছেন!' সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে, যে-দেশটিকে সামনে রেখে তিনি ওই নাটকটি লিখেছিলেন সেই দেশ ইংলিশ চ্যানেলের ও পারে অবস্থিত নয়, পারেই।

ঘটনাটি মজার এবং আমার এই আলোচনায় অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সিংহের পা থেকে কাঁটা তুলে দেওয়ার সেই প্রাচীন গল্প। এবং সিংহটি অকৃতজ্ঞ নয় বলেই পরে এক নাটকীয় মুহূর্তে যখনই সে অ্যান্ড্রোক্লিসকে চিনতে পারল তখন আর তার ওপর হামলে পড়ল না, কাছে এল, কৃতজ্ঞতা জানাল, ল্যাজ নাড়াল, গা চেটে দিল। কিন্তু তাই দেখে এ-যুগের এক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজপুরুষ খেপে উঠবেন কেন? এবং খেপে গিয়ে সমস্ত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বেরিয়েই বা আসবেন কেন?

নিশ্চয়ই ভদ্রলোক খেপেছিলেন inquisition-এর দৃশ্যে যেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়ে শাসক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যে-কোনও বিরুদ্ধ নীতি, বিরুদ্ধ মত অথবা যে-কোনও নতুন বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এই হল নাটকের কেন্দ্রবিন্দু, শাসকের নোংরা অস্বাস্থ্যকর এই চেহারাটা তুলে ধরাই হল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এবং এখানে এসেই গোটা কাহিনিটি একটা তাৎপর্য পেল। সঙ্গে সঙ্গে শাসক-প্রতিনিধি নিজেকে দেখতে পেলেন, শাসনযন্ত্রের কদর্য রূপটি তাঁর চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠল, রঙ্গমঞ্চে এতগুলো লোকের সামনে তা তাঁকে বিদ্রুপ করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত ভয়ে রাগে ও লজায় ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন ও এ-যুগের নাট্যকার শ আশ্বস্ত হলেন। যাঁরা রাজপুরুষটির সঙ্গে বেরিয়ে এলেন না, শেষ পর্যন্ত নাটকটি উপভোগ করলেন, তাঁরা নিজেদের এবং চারপাশের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীন গল্প আর আজকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিতরে কোথাও একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলেন।

এই যোগসূত্রকেই ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাস্ট-ও তাঁর শিল্পকর্মে বারবার তুলে ধরেছেন। এবং এই সত্যটিকেই তিনি বলেছেন 'ancient consistency of mankind' যিশু খ্রিস্টের জন্মের চারশো বছর আগেকার বিদ্রোহী ক্রীতদাস স্পার্টাকাস-কে নিয়ে ফাস্ট উপন্যাস লিখলেন, পুরোনো ঘটনাকে নতুন করে বললেন, ইতিহাসের এতটুকু বিকৃতি না ঘটিয়ে একালের শ্রেণিসংগ্রামী মানসিকতা দিয়ে প্রাচীনকালের সেই সংগ্রামকে ও সংগ্রামী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলেন এবং শিল্পসম্মত ঢঙে রূপ দিলেন।

এবং একইভাবে খ্রিস্টের জন্মের দেড়শো বছর আগে তদানীন্তন গ্রিকসিরীয় শাসনের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় ইহুদি কৃষিজীবীর লড়াই ও মুক্তির অলিখিত ইতিহাসকে ফাস্ট একালীন অভিজ্ঞতার ভিতিতে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করলেন 'My Glorious Brothers' উপন্যাসে।

শ তাঁর নাটকের ধর্মীয় বিরোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন গল্পকে বিচার করলেন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। থিয়োলজি নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি, সিংহের কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে পাতাও ভরাননি। তিনি প্রাচীন ও অতি প্রচলিত একটি গল্পকে অবিকৃত রেখেই সেই উপাদানে মধ্য দিয়ে আধুনিক শাসনব্যবস্থার কুৎসিত রূপটিকে তুলে ধরলেন। ফলে, নাটকে আজকের কথা বিধৃত হল এবং একালের দর্শক নাটকের মধ্যে একালের পৃথিবীকে আবিষ্কার করলেন।

ফাস্টের উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। প্রাচীন ইতিহাস অক্ষতই রইল, কিন্তু যে-উপাদান দিয়ে সেই ইতিহাস তৈরি হয়েছিল, উপন্যাসে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হল শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, শিল্পী 'ancient consistency of mankind' আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন এবং পাঠক দেখলেন এ যেন আজকেরই সংগ্রামের কাহিনি— ব্যক্তির ও সমষ্টির।

কিন্তু চলচ্চিত্রে যে Spartacus-টিকে দেখতে পাওয়া যায়, শিল্পীর সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহাতই জাঁকজমকে ভরা সে যুগের একটি অতি সীমাবদ্ধ গল্প— শুধুই গল্প, যার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই, ইতিহাসের অনিবার্যতার কোনও লক্ষণ নেই, যার সবটাই স্থূল শারীরিকতায় উপস্থাপিত। যাতে আত্মার আমেজ নেই এতটুকু এবং অধুনা এ-দেশীয় সাহিত্যে তথাকথিত ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্পে উপন্যাসে নাটকে যার দৃষ্টান্ত অজস্র। অথচ চিত্র-নির্মাতার যদি ইতিহাসের সেই বোধ থাকত, যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থাকত তাহলে আজকের দর্শক হয়তো প্রত্যক্ষ করতেন নিজের অভিজ্ঞতাকে এবং চারপাশের চেনা জগৎটাকে।

তাই বলব, পুরোনো বা টাটকা ঘটনা বলে নয়— যে-কোনও ঘটনা, যে-কোনও গল্প, যা কিছু আজকের মানুষকে আজকের কথা মনে করিয়ে দিতে পারবে, আজকের কথা ভাবিয়ে তুলবে, আজকের বস্তুজগতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে, তাই সমকালীন বলে নির্ণীত হবে। শুধুমাত্র আজকের ব্যবহারিক জীবনের উপাদান দিয়ে তৈরি কাহিনিই নয়, যে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা, পৌরাণিক ধর্মীয় বা অধর্মীয় আখ্যান অথবা উপকথা রূপকথা সব কিছুই তাদের প্রাচীনত্ব ঘুচিয়ে সমকালীন শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে, যদি অবশ্য বর্তমানের সমস্যা সংকট সংঘাতের সঙ্গে সেই যুগের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এবং যদি, সর্বোপরি , সেই কাহিনি একালের মনস্তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ নিশ্চয়ই বড়ো রকমের একটি শিল্পকর্ম, কিন্তু রাম-রাবণের চরিত্রকে মাইকেল মধুসূদন যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন, যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করলেন, সেই ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক চিন্তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তাই শিল্পের বিচারে মেঘনাদবধ কাব্যের সমকালীনতার দাবি অনস্বীকার্য।

পক্ষান্তরে চলচ্চিত্রে এমন প্রায়ই দেখা যায় (এবং অধুনা জনপ্রিয় সাহিত্যেও এর নজির অপ্রচুর নয়) যেখানে আধুনিক জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণই বর্তমান— ট্রাম-বাস, চা-খানা, বড়োলোকের বাড়ির লাউঞ্জ, নিম্নবিত্তের অপ্রশস্ত ঘর, গরিবের বস্তি, সবই— অথচ সমস্ত থেকেও গোটা ব্যাপারটা যেখানে কেমন যেন সেকেলেই থেকে যায়। দৃশ্যবস্তুতে যেখানে আধুনিকতার এক ব্যর্থ ও স্থূল, অনুকরণ জড়িয়ে থাকে সর্বত্র— সমস্তটাই ভাসা ভাসা, ওপর ওপর অথচ ভিতরে ঘটনায় ও চরিত্রের আচরণে ব্যবহারে, চরিত্র ও ঘটনার মূল্যায়নে একালের চেহারা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে, যেহেতু কাহিনির চরিত্রগুলো আধুনিক সাজসজ্জায় ঘুরছে-ফিরছে, ট্রামে-বাসে বা গাড়িতে চাপছে এবং ডানলোপিলোর গদিতে অথবা সস্তা হ্যান্ডলুমের চাদর পেতে ঘুমুচ্ছে, এমনকি রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওরা অথবা রাস্তায় মিছিলে শামিল হয়ে শ্লোগান তুলছে, আর তাই কাহিনিটি সমকালীন হয়ে উঠবে এ কথা ভাবার অথবা এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার কোনও কারণ নেই। কাহিনিতে এবং কাহিনির চরিত্রগুলোর মধ্যে একালের হাওয়া বইয়ে দিতে হবে, একালের মনস্তত্ত্বে ব্যাখ্যা করতে হবে সবকিছু, বিশ্লেষণ করতে হবে একালের ঢঙে— তবেই তা একালের কাহিনি হয়ে উঠবে। অর্থাৎ সমকালীনতা নির্ণীত হবে ব্যবহার্য উপাদান থেকে নয়— কীভাবে সেই উপাদানকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কী ঢঙে তার বিশ্লেষণ হচ্ছে তার ওপর। কোনও কাহিনিতে আড়াই হাজার বছর আগেকার ঈশপ-বর্ণিত ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাকের ছায়া রয়েছে অতএব কাহিনির প্রাচীনত্ব ঘুচল না এ কথা মনে করার যেমন কোনও যুক্তি নেই, ঠিক তেমনি ভুল করে বসবেন যদি কেউ আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণে ঠাসা কাহিনিমাত্রকেই সমকালীন জ্ঞান করেন।

মূল্য নিরূপণে এ ধরনের ভুল চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটু বেশিরকমই হয়ে থাকে। তার কারণ, চলমান ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের মারফত যতখানি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে চলচ্চিত্রে

বাস্তবের শারীরিক উপস্থাপন সম্ভব, এমন আর কোনও শিল্পমাধ্যমেই সম্ভব নয়। এবং বাস্তবের শারীরিক উপস্থিতি চলচ্চিত্রে সহজলভ্য বলেই দর্শকের মন পেতে চিত্রনির্মাতার বিশেষ বেগ পেতে হয় না। নির্জন দুপুরে দূরে গলির মোড় থেকে যখন আইসক্রিমওয়ালার হাঁক শোনা যাবে— ম্যাগনোলিয়া!— প্রেক্ষাগৃহে বসে দর্শক তখন বিনা দ্বিধায় নিজেকে ভিড়িয়ে দিতে চাইবেন সেই সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে। অথবা, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কর্পোরেশনের লোকেরা যখন রাস্তা ধুইয়ে দেবে ও সেই ভেজা রাস্তায় সাইকেলে চেপে কাগজওয়ালা কাগজগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে ছুড়ে মারবে এ-বাড়ির দোতলায়, ও-বাড়ির দেড়তলায়, গ্যারেজ ঘরের ওপরে আর ঝি বা চাকর কাগজ কুড়িয়ে এনে দেবে বাড়ির কর্তাকে, এবং সঙ্গে ধোঁয়া উঠছে এমনি গরম চা, দর্শক অবশ্যই তখন অসম্ভব মজা পাবেন, এবং দর্শকের মধ্যে যাঁরা কম বেশি অসতর্ক তাঁরা হয় তো আগ বাড়িয়েই গল্প সম্পর্কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু বাড়তি রকমের পক্ষপাতিত্ব করে বসবেন। উলটোটাও ঘটছে হামেশাই। ঘটছে বলেই আজ থেকে ন'বছর আগে 'অপরাজিত'-র মতো এক অসামান্য আধুনিক ছবি তৈরি করা সত্ত্বেও কোনও কোনও দায়িত্বশীল মহল থেকে বলা হয়ে থাকে, সত্যজিৎ রায় নাকি সমকালীন জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। অপরাজিত-তে যে-গ্রাম আমরা দেখেছি তাতে দূরে আকাশের গায়ে ডি-ভি-সি-র হাই টেনশন তার অনুপস্থিত সন্দেহ নেই, 'অপরাজিত'-র কলকাতায় নিয়নে সাইনের একটা বিজ্ঞাপনও দেখা যায়নি, রাস্তায় ট্র্যাফিকের অটোমেটিক লাল হলুদ সবুজ আলো তাও দেখিনি। দেখিনি, কেননা কাহিনির কাল গত মহাযুদ্ধেরও বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু দেখছি সদ্য কৈশোর পেরোনো একটি ছেলেকে যে তার ছোট্ট সংসারের সীমানা ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়িয়েছে বৃহত্তর এক জগতের মুখোমুখি— অচেনা ও বিশাল— প্রতি পদক্ষেপেই যেখানে ভয়, বিস্ময়, ভালোলাগা— প্রতিটি সম্পর্ক গড়ে উঠতেই যেখানে জটিলতা। দেখেছি মা ও ছেলের সম্পর্কের সূক্ষ্ম, স্পষ্ট ও বিচিত্র বিশ্লেষণ, যেখানে তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে একমাত্র ছেলের উচ্চশিক্ষার অদম্য আগ্রহের প্রতি মার মনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এবং সমস্ত মিলিয়ে বর্তমান যুগের মননশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'অপরাজিত'-কে দেখি তখন উঁচু গলায় স্বীকার করি— এ-দেশে এ-যাবৎ যত ছবি তৈরি হয়েছে, এইটিই তাদের মধ্যে আধুনিকতম।

চলচ্চিত্রে সমকালীনতার বিচারে এহেন টালমাটাল দশার মূলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রয়েছে সরলীকরণের প্রতি এক অতি অস্বস্তিকর ঝোঁক। যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্যে যা প্রয়োজন তা হল বাস্তবের স্থূল শারীরিকতায় আকৃষ্ট না হয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করা, আধুনিকতা সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া, আরও সতর্ক হয়ে ছবি দেখা।

আরও একটি কথা:

সমকালীন চলচ্চিত্রের আসরে পৃথিবী জুড়ে নব্য রীতির চলচ্চিত্রকারেরা আজ যে-বস্তুটি নিয়ে মেতেছেন তা হল ব্যক্তিজীবনে একালের অস্থিরতা, আধুনিক মানসের অব্যবস্থচিত্ততা ও তার আত্মিক সংকট— যার চলচ্চিত্রায়ণ ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের নতুন নতুন যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং সেগুলোর সুষ্ঠু ও শিল্পসম্মত প্রয়োগের ফলে নিদারুণ সত্য, স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠছে। চলচ্চিত্রায়ণের সাবেকি নিয়মগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে নব্য চিত্রকারেরা নতুন ঢঙে নতুন সাজে পরিবেশন করছেন তাঁদের বক্তব্যকে— অবশ্যই নতুন ফ্যাশন আমদানি করতে নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই ঐকান্তিক তাগিদে।

মানুষের সমস্যা বাড়ছে, মনোজগতের সংকট বাড়ছে। মনস্তত্ত্ব জটিলতর হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনী ক্ষমতাও বাড়ছে দিন দিন।

সমকালীন চলচ্চিত্রের দরবারে চলচ্চিত্রের এই আঙ্গিকগত উদ্ভাবনের ওজনটাও বড়ো কম নয়।

মৃণাল সেন রচিত প্রবন্ধ *চলচ্চিত্র— ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ* বইটি থেকে এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হল। প্রকাশক: সপ্তর্ষি প্রকাশন (২০১৩)

mio
amore
TM
THE CAKE SHOP

Issue date 16 January 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 2 Arek Rakam

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.